

ওয়েস্টার্ন
মৃত্যুর স্বাদ
রকিব হাসান



মৃত্যুর স্বাদ

গল্পটা বলেছিল একজন বুড়ো সৈনিক, বহু বছর আগে। হালপ করে বলেছে সে, এটা সত্যি ঘটনা। কেউ বিশ্বাস করেছে তার কথা, বিশ্বাসে থে হয়ে থেকেছে। কেউ করেনি, হেসেছে মুখ বাঁকিয়ে। আড়ালে গিয়ে বলেছে, 'গুল মারার আর জায়গা পায়নি।'

সত্য কি মিথ্যে সে তর্কে গেলে অনেক কথাই আর শোনা হয় না, অনেক বিশ্বাসের সত্যি ঘটনাও চাপা পড়ে যায় বিশ্বাসের আড়ালে। কাজেই, মনে হয় বলে ফেলাই ভাল। যে বিশ্বাস করল, করল, যে করল না, করল না।

যাকে নিয়ে এই গল্প, তার নাম বিল ডেনভার। অনেক অ্যাডভেঞ্চারই করেছে সে জীবনে, তবে এক সেন্টেম্বরের সকালে দক্ষিণ ডাকোটার একটা ঘিজলি ভালুকের সঙ্গে হাতাহাতি হওয়ার পর যে ঘটনা ঘটিয়েছে তার কোন তুলনা হয় না। তখন তার বয়েস চল্লিশ। কিছু কিছু মানুষের টিকে থাকার বিশ্বাসের ক্ষমতার এটা একটা উদাহরণ। আমেরিকার বুনো পশ্চিম সম্পর্কে অনেক রোমাঞ্চকর গল্প শোনা যায়। কেউ হয় দক্ষ পিস্তলবাজ, কেউ অসাধারণ দুঃসাহসী, কেউ বা আবার বিন্দুমাত্র প্রাণের মায়া না করে বেরিয়ে পড়ে সাংঘাতিক সব অ্যাডভেঞ্চারে। বিল ছিল একজন অ্যাডভেঞ্চারার।

শুরুতে নাবিক ছিল সে, অফিসার। ১৮১৭ সালে ক্যারিবিয়ান সাগরে কুখ্যাত জলদস্যু জাঁ ল্যাফিটির হাতে বন্দি হয়। সমস্ত নাবিকসহ বিলের জাহাজ দখল করে ল্যাফিটি। বেঁচে থাকার একটা সুযোগ দেয় বিলকে—হয় তার সঙ্গে দস্যুতায় যোগ দিতে হবে, নয়তো তক্ষুণি অন্য দুনিয়াম পাড়ি জমাতে হবে। মরার চেয়ে ডাকাতে হতেই বেশি আগ্রহ দেখায় বিল। কিন্তু বছরখানেকের বেশি সহ্য করতে পারেনি। গ্যালভেস্টন আইল্যান্ডে থাকার সময় একদিন ল্যাফিটির আদেশ অমান্য করে বসে। তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। পালায় সে। একজন সঙ্গীকে নিয়ে সাততের বহু মাইল বিপদসঙ্কল সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়ে গিয়ে ওঠে আমেরিকার উপকূলে। তার প্রধান দুর্ভিক্ষ ছিল তখন নরখাদক ইনডিয়ানদের নিয়ে। লুকিয়ে লুকিয়ে এগোতে থাকে। উদ্দেশ্য, লুইজিয়ানা সীমান্ত দিয়ে টেকসাসে ঢুকে পড়া।

কারানকাউয়া নরখাদকদের ফাঁকি দিল সে ঠিকই, কিন্তু হিসেবে গোলমাল করে পথ হারিয়ে ফেলল। উত্তর-পূবে যাওয়ার বদলে সরে চলে এল উত্তর-পশ্চিমে।

সূচি:

মৃত্যুর স্বাদ—	৫
খুনের পাহাড়—	১৯
দুশমন—	৫৩

নুইজিয়ানায় না ঢুকে ঢুকল গিয়ে পশ্চিম কানসাসে, পাউনি ইনডিয়ানদের এলাকায়। ধরা পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দেবতার উদ্দেশ্যে তার সঙ্গীকে বলি দিয়ে দেয়া হলো। কিন্তু অসামান্য দক্ষতায় বিল পটিয়ে ফেলল ইনডিয়ানদের সর্দারকে। তার কাছে সামান্য কিছু জিনিস ছিল, সেগুলো উপহারও দিল। তার ব্যবহারে এবং উপহার পেয়ে সর্দার এতই খুশি, মৃত্যুদণ্ড তো মকড়কুফ করে দিলই, বিলকে ধর্মপুত্র করে নিল।

১৮১৯ সাল পর্যন্ত পাউনি সেজে রইল বিল। তারপর একদিন তার ধর্মপিতা সেইন্ট লুইসে রওনা হলো উইলিয়াম ক্লার্কের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। ক্লার্ক তখন ইনডিয়ান অ্যাফেয়ার্সের সুপারিনটেনডেন্ট। বিলকে সঙ্গে নিল সর্দার। সেইন্ট লুইসে এসে আবার সাদা-মানুষ হয়ে গেল বিল।

১৮২০ সালের বসন্তে অ্যাশলি-হেনরির দলে যোগ দিয়ে মিসৌরির উজানে পার্বত্য অঞ্চলে রওনা হলো বিল। নতুন প্রদেশ মিসৌরির একজন বেশ ক্ষমতাসালী লোক তখন জেনারেল অ্যাশলি। সেনাবাহিনী ছেড়ে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন। ফারের ব্যবসা করে টাকা কামাচ্ছেন দেন্দার। আগের বছরও আরেকটা দলকে পার্বত্য অঞ্চলে পাঠিয়েছেন ফার সংগ্রহ করে আনার জন্যে। তিনি শুনেছেন, পেরুর সোনার খনিতে যত সম্পদ আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি সম্পদ নাকি আছে মিসৌরির উজানে বনে-প্রান্তরে। টাকার লোভ নেই বিলের, কেবল অ্যাডভেঞ্চারের লোভেই ভিড়ে গেল অ্যাশলির সঙ্গে।

দূর্ঘর্ষ আরিকারা (আমেরিকানরা নাম বিকৃত ও সংক্ষিপ্ত করে রী বলে ডাকত) ইনডিয়ানদের এলাকার ভেতর দিয়ে গেছে পথ। বাধা দিল ওরা। পিছিয়ে আসতে হলো অ্যাশলির দলকে। লড়াইয়ে মারা গেল পনেরোজন সৈন্য, আহত হলো অনেক। পায়ে আঘাত পেল বিল। অ্যাশলি বুঝলেন এই বিজয়ের পর আরও বেশরোয়া হয়ে উঠবে রী-রা। তার আপ্যেই ওদেরকে দমন করতে হবে। সৈন্য সাহায্য চেয়ে আমেরিকান সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সংবাদ পাঠালেন তিনি।

সাহায্য পাঠানো হলো। কিন্তু হিসেবে ভুল করে সব ভজ্জট করে দিলেন দলপতি কর্নেল লিভেনওয়ার্থ। তাঁকে নাকামি-চুবানি খাইয়ে ছেড়ে দিল রী-রা। সাহস আরও বেড়ে গেল ওদের।

দলবল নিয়ে নদীর ভাটিতে নেমে যেতে বাধ্য হলেন অ্যাশলি আর তাঁর ফিল্ড লীডার মেজর আনড্রু হেনরি। ভীষণ হতাশ তাঁরা। নদীপথ বন্ধ। সামনে এগোতে হলে এখন স্থলপথ ছাড়া গতি নেই। ফোর্ট কিউয়া থেকে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে কয়েকটা ঘোড়া হয়তো জোগাড় করা যায়। চড়ে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, ইয়েলোস্টোনের ফোর্ট হেনরি পর্যন্ত রসদ বয়ে নিতে পারলেই ধরে নিতে হবে ভাগ্য খুবই ভাল। ঘোড়ার জন্যে মেজর হেনরির ফোর্ট হেনরির সিদ্ধান্ত নিলেন অ্যাশলি। উধাও হয়ে গেছে রী-রা। কোথায় গেছে কেউ জানে না। এই পরিস্থিতি আরও

খারাপ। যে কোন সময় যে কোনখানে ওদের সামনে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে এখন।

আগস্টের মাঝামাঝি ফোর্ট কিউয়া থেকে তেরোজনের দল নিয়ে মিসৌরির উজানে রওনা হলেন হেনরি। পশ্চিমে চলে যাবেন একেবারে গ্যাও রিভার পর্যন্ত। দক্ষিণ ডাকোটার সাংঘাতিক দুর্গম অঞ্চলের ভেতর দিয়ে গেছে পথ। কাঁটাঝোপে ভরা, নির্জন, শুকনো, বসতিহীন অঞ্চল। কয়েক রাত পরেই আক্রমণ করল ইনডিয়ানরা। দুজন লোক মারা গেল তাঁর, আরও দুজন আহত হলো।

দলে বিলও রয়েছে। দলপতির কথা মানতে চায় না, বেশরোয়া, বেয়াড়া, নিজের মন মত চলে। এভাবে চলতে গিয়েই পড়ল গ্রিজলি ভালুকের খপ্পরে। একটা ঝোপের ভেতর দুই বাচ্চাকে নিয়ে শুয়ে ছিল ভালুকটা। মানুষ দেখে গেল খোপে। তেড়ে এল।

রাইফেল তুলে ভালুকের বুক গুলি করল বিল। ভেবেছিল এক গুলিতেই খতম হয়ে যাবে। কিন্তু হলো না। আরেকবার নলে গুলি ভরে পাউডার ঠাসতে ঠাসতে ডিরিশ সেকেন্ড লেগে যাবে। অত সময় নেই। ফলে যা করার তাই করল সে। রাইফেল ফেলে সাহায্যের জন্যে চিৎকার করতে করতে দিল দৌড়।

দশ কদমও যেতে পারল না। ধরে ফেলল তাকে ভালুক। এক থাবায় ফেলে দিল মাটিতে।

দলে দুজন অভিজ্ঞ সৈনিক আছে। একজন স্ল্যাক হ্যারিস, আরেকজন হিরাম অ্যালেন। বিলের চিৎকার শুনে প্রথম সেখানে গিয়ে পৌছল হ্যারিস। ভালুকের একটা বাচ্চা তাড়া করল তাকে। নিয়ে গিয়ে ফেলল পানিতে। বুক পানিতে দাঁড়িয়ে বাচ্চাটাকে গুলি করে মারল সে।

দলের অন্যেরা এসে দেখল ছুরি নিয়ে বিশাল এক ভালুকের সঙ্গে লড়াই করছে বিল। ভালুকটা থাবা মারছে, চিরে ফালাফালা করছে নখ দিয়ে, আর বিলও চিৎ হয়ে পড়ে থেকে যেভাবে পারছে ওটার গায়ে ছুরি বসচ্ছে।

মুহূর্ত দেরি না করে গুলি চালাতে শুরু করল ওরা। বিলের গুলি আর ছুরির আঘাতেই অনেকটা কাহিল হয়ে গিয়েছিল ভালুকটা। টলে পড়ল বিলের পাশে।

তাকানো যায় না বিলের দিকে। সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত। গালের হাড় দেখা যায়। পাঁজরের হাড় ভেঙেছে। প্রতিবার দম নেয়ার সময়ই ভুরভুর করে রক্তের বৃদবৃদ বেরোয় গলা থেকে। অস্ত্রত পনেরোটা মারাত্মক আঘাত রয়েছে, যার একটাই মানুষের মৃত্যু ঘটানোর জন্যে যথেষ্ট।

সবাই বুঝল, আর কয়েক মিনিটের বেশি বাঁচবে না বিল। তার দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ সহানুভূতির হাসি হাসল তারা, কোন সাহুনা দিতে পারল না। কয়েক মিনিট পর যখন মরল না সে, ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। কারণ লাশটাকে কবর দেয়ার পর সেদিন আর দিনের আলো থাকবে না।

রাত হলো। ওদেরকে অবাক করে দিয়ে তখনও মরল না বিল।

মরল না সকালেও। জটিল হয়ে গেল পরিস্থিতি। আরেকটা রাত এখানে কাটানো বিপজ্জনক। রী-রা যে কোনখানে থাকতে পারে। এক জায়গায় বেশি সময় কাটাতে গেলে টের পেয়ে চলে আসতে পারে ওরা। তার আগেই নিরাপদ জায়গায় পালানো দরকার। বিপদে পড়ে গেলেন হেনরি। মুমূর্ষু একজন মানুষকে এভাবে ফেলে যাওয়াটা অমানবিক, আবার প্রায় মৃত একজনের জন্যে সূস্থ দশটা ঔষধের গুঁটি নেয়াটাও বোকামি। ইতিমধ্যেই অস্তির হয়ে উঠেছে সবাই। শেষে আর কোন উপায় না দেখে বললেন, দুজন লোক বিলকে কবর দেয়ার জন্যে থেকে গেলে ভাল হয়। কোন চাপাচাপি নেই। কেউ যদি ইচ্ছে করে থাকতে চায় তবেই থাকবে।

রাজি হয়ে গেল উনিশ বছরের এক নিগ্রো তরুণ। নাম জিম ব্রিজার। কিন্তু এরকম একটা অনভিজ্ঞ ছেলেকে এই ভয়ঙ্কর এলাকায় একলা ফেলে যাওয়া আর তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া একই কথা। অন্যদের দিকে তাকালেন হেনরি। অভিজ্ঞ আরও একজনকে বলছে যেতে চান ছেলোটোর সঙ্গে।

জন ফিজেরাল্ড নামে একজন বলল, নিরানন্দই ভাগ মরা একটা প্রায় লাশের জন্যে দুজন মানুষের মাথা কাটা পড়াটা কি উচিত হবে? রীদেব বিশ্বাস নেই। হেনরি তর্কন ঘোষণা করলেন, যে থাকবে তাকে চল্লিশ ডলার পুরস্কার দেয়া হবে। এত টাকা ফিজেরাল্ডের তিন মাসের বেতন। সামান্য ষিধা করে সেই থাকতে রাজি হয়ে গেল।

সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। আর একটা মুহূর্তও দেরি না করে ক্যাম্প ভাঙার নির্দেশ দিলেন হেনরি। যত জলদি পারেন বাকি আটজনকে নিয়ে পৌঁছে যেতে চান ইয়েলোস্টোনে।

বেশ গর্বিত ভাবভঙ্গি তখন জিমের। তার ধারণা, সবগুলো চোখই প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তার দিকে। কল্পনাও করছে না, 'ব্রেঞ্চ বোকা' বলে তার জন্যে মনে মনে আফসোস করছে এখন অভিজ্ঞ মানুষগুলো।

ক্যাম্প তুলে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা। একটা কি দুটো ঘণ্টা ফিজেরাল্ড কিংবা বিলের দিকে কোন নজরই দিল না জিম। চূপচাপ বসে থাকিয়ে রইল তার রাইফেলের দিকে। মন চলে গেছে মিসৌরিতে, বাড়িতে। কামারের কাজ করতে হত তাকে। ঘুণা করত কাজটোটা। মনে হত, বাপের কামারশালায় বসে গোলামি করছে। তাকিয়ে থাকত নদীর দিকে। দেখত নদীতে ভেসে যাওয়া কীলবোটগুলোকে। ধুকধুক ধুকধুক করে চলেছে উজানের বুনো অঞ্চলের দিকে, গুলোতে চেপে তারও বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করত অজানার উদ্দেশে। ওসব অঞ্চল থেকে ফিরে এসে অনেক রোমাঞ্চকর গল্প বলত মানুষ। সে সব শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে যেত সে। বারো বছর বয়স থেকেই স্বপ্ন দেখেছে সেখানে যাওয়ার। সেই সুযোগ সে পেয়েছে। এসেছেও এখানে। তারপর? মলিন, বিষণ্ণ হাসি হাসল রাইফেলটার দিকে তাকিয়ে।

ফিজেরাল্ডের কথায় চিন্তায় ছেদ পড়ল তার, 'আমি আশপাশটা ঘুরে দেখতে যাচ্ছি। তুমি ওকে দেখো!'

কি দেখবে বুঝতে পারল না জিম। কি দেখার আছে? কি করার আছে? একটাই কাজ আছে, সেটা বিলের মৃত্যুর পর। তাকে কবর দিতে হবে।

ফিজেরাল্ড চলে গেল উঠে দাঁড়াল সে। তাকাল বিলের দিকে। ভয়াবহ সব ক্ষত। শার্ট ছিড়ে ছিড়ে ব্যাণ্ডেজ করে দেয়া হয়েছে কোনমতে। জখম পুরো ঢাকেনি তাতে, বেরিয়ে আছে। গা গুলিয়ে উঠল তার। আহত মানুষটার পাশে পড়ে আছে একটুকরো ছেঁড়া কফন। সেটা তুলে নিয়ে গিয়ে বর্না থেকে ডিজিয়ে এনে একটা কোণ চেপে ঢুকিয়ে দিল তার ঠোঁটের ফাঁকে।

সামান্য কৈঁপে উঠল বিলের চোখের পাতা। চুষতে শুরু করল ভেজা কফনটা। বড় ধীর হয়ে পড়েছে যেন সময়। কাটতে আর চায় না। কিছুই করার নেই অপেক্ষা করা ছাড়া। ষাওয়ার জন্যে পানি আছে, আর সঙ্গে আছে শুকনো মাংস। তাজা মাংসের জন্যে গুলিও করা যাবে না। শব্দ শুনে হাজির হয়ে যেতে পারে রী-রা। তবে ঝোপের মধ্যে একধরনের বুনো জাম আছে, মোষেরা খায়, সেগুলো তুলে এনে ষাওয়া যেতে পারে।

কফন চোষা থেমে গেছে। সেটা বের করে আনার জন্যে হাত বাড়াল জিম। পেছনে কথা বলে উঠল ফিজেরাল্ড, 'নিঃশ্বাস কেমন?'

বিলের নাকের কাছে হাত রাখল জিম। 'খুবই আস্তে। থেমে থেমে।' 'বেশি দেরি আর করবে না তাহলে। তাড়াতাড়ি গেলেনি বাঁচি। এরকম জায়গায় একা থাকতে ভয় লাগে।'

শুনতে ভাল লাগল না জিমের। একা কোথায় ফিজেরাল্ড? জিমকে গোণায়ই ধরছে না। এটা এক ধরনের অবহেলা। নীরবে উঠে গিয়ে ঝোপ থেকে একসুতো জাম পেড়ে আনল। চিপে চিপে সেগুলোর রস ফেলতে লাগল বিলের ঠোঁটের ফাঁকে।

চূপচাপ বসে আছে ফিজেরাল্ড। তাকাচ্ছেও না জিম কিংবা বিলের দিকে। তবে তার অস্বস্তিটা টের পাচ্ছে জিম।

রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে মোটা কফন গায়ে দিয়ে গুয়ে পড়ল দুজনে। রীদেব ভয়ে আতনও জ্বালতে পারছে না। অন্ধকারে গুয়ে জিম আশা করছে ফিজেরাল্ড কথা বলুক। যা খুশি বলুক। অন্তত বোঝা যাক, দুজন মানুষ আছে এখানে। বিল তো থেকেও নেই। সকাল পর্যন্ত টিকবে কিনা কে জানে। মরা মানুষকে এখন আর ভয় করে না জিম। দেড় বছর হলো এসেছে এই পার্বত্য এলাকায়। আসার পর থেকে কত মানুষকে যে মরতে দেখেছে। মৃত্যু গা-সওয়া হয়ে গেছে এখন। তবু, অন্ধকারে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে কয়েক ফুট দূরে পড়ে থাকা আবছা কালো আকৃতিটার দিকে তাকিয়ে ছমছম করে উঠল শরীর। অদ্ভুত একটা অনুভূতি। পাশে গুয়ে থাকা ওই দেহটা জীবিত না মৃত বোঝা যাচ্ছে না।

কিন্তু পরদিন সকালেও দেখা গেল বেঁচে আছে বিল। তার গায়ে হাত দিয়ে দেখল ফিজেরান্ড। বলল, জ্বর এসেছে। আর বেশিক্ষণ বাঁচবে না। রক্তপাত আর ক্ষতের যত্নগায় শেষ না হলেও জ্বরের আক্রমণ সহিতে পারবে না।

এসব কথা শুনতে বিল লাগল না জিমের। তবু আশঙ্কা যেন তার মনকে খামচি দিয়ে ধরল। যদি আরও চোদ্দ দিনেও মারা না যায় বিল? কি করবে ওরা?

বসে থেকে থেকে সময় কাটে না। ঘুরতে বেরোল সে। একধরনের মরু অঞ্চলই বলা চলে জায়গাটাকে। রোদে পুড়ে মিহি বালিতে পরিণত হয়েছে জমির ওপরের অংশের মাটি। রোদ আর বাতাসে শুকিয়ে খটখটে করে দিয়েছে সেজ-ঝোপ আর কটনউড়কে। অল্প কিছু পাতা যা-ও বা লেগে আছে ওগুলোতে, তা-ও সবুজ নয়, ধূসর। যেদিকে চোখ যায় পাহাড় আর টিলাটকর, কাঁটাঝোপে ছাওয়া। নীরব, রুক্ষ, কেমন শূন্য প্রকৃতি।

সে রাতে গায়ে কঙ্কল জড়িয়ে শুয়ে শুয়ে চারপাশের শূন্যতার কথা ভাবতে লাগল জিম। কোন আশ্রয় নেই এখানে, নেই নিরাপত্তা।

তৃতীয় দিন সকালেও মারা গেল না বিল। মৃদু স্বরে থলাপ বকছে থেকে থেকে। মাঝে মাঝে চোখও মেলছে। শূন্য দৃষ্টি।

বিড়বিড় করে গাল দিচ্ছে ফিজেরান্ড। কাকে কি বলছে বোঝা যায় না। তিনদিন ধরে আছে জিমের সঙ্গে, কিন্তু কথা বলে না। ব্যাপারটা এখন আর অবাধ করে না জিমকে। পার্বত্য অঞ্চলে থাকতে থাকতে কেমন যেন হয়ে যায় মানুষলো। বোবা। নিষ্ঠুর। নিজেকে ছাড়া যেন আর কিছুই বোঝে না।

চার দিনের দিন সকালে দ্বিধায় পড়ে গেল জিম, বুঝতে পারল না বিল বেঁচে আছে না মরে গেছে। বৃকের ওঠা-নাড়া চোখে পড়ছে না। বোধহয় মৃত্যুর কাছাকাছি চলে গেছে। গা ঠাণ্ড। জ্বর প্রায় নেই।

বিকেল বেলা কথা বলতে শুরু করল ফিজেরান্ড। হঠাৎ করেই জিমের প্রশংসা শুরু করল, তার মত ভাল লোক হয় না, নিজের প্রাণের মায়া না করে রয়ে গেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আরও নানা কথা। এই যেমন, যতটা করেছে ওরা, চল্লিশ ডলারের তুলনায় অনেক বেশি করে ফেলেছে। বিল তো মরবেই। কোনমতেই সে বাঁচবে না। ওরকম একটা প্রায়-নাশের কাছে দিনের পর দিন বসে থাকার কোন মানে হয় না।

মরল না বিল। পরদিন সকালেও বেঁচে রইল। অস্থির হয়ে উঠেছে ফিজেরান্ড। কিছুতেই পথে আনতে পারছে না জিমকে। তার ইঙ্গিত যেন বুঝতেই পারছে না ছেলোটা।

ঠিকই পারছে জিম। কিন্তু কানে ভুলছে না।

সেদিন বিকেলেও একই অবস্থা বিলের। সেই প্রায়-মৃত্যুর জগতে রয়ে গেল। না ফিরল হাঁশ, না মরল।

পরদিন সকালে চোখ মেলল বিল। শূন্য দৃষ্টি আর নেই। ফিজেরান্ডকে জানাল

মৃত্যুর স্বাদ

সেকথা জিম।

‘নেই তো ভাল কথা,’ কর্কশ কণ্ঠে বলল ফিজেরান্ড। ‘থাকুক। চোখদুটো এখন তার দরকার হবে।’

মালপত্র গোছাতে শুরু করল সে। ‘অনেক বেশি থেকে ফেলেছি, আর না। চল্লিশ ডলারে পাঁচ দিন থাকার কথা নয় আমাদের। কিন্তু থেকেছি।’ একটা ঘোড়া রেখে যাওয়া হয়েছিল। মাল গুছিয়ে নিয়ে তাতে তুলল। ‘আমি আর থাকছি না।’

কিছু বলছে না জিম। তাকিয়ে আছে বিলের দিকে। আধবোজা হয়ে আছে চোখ। দু-একবার পাতাও নড়ল। হয়তো ঘোরের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু জিমের মনে হচ্ছে, সব দেখতে পাচ্ছে বিল, ওদের কথা শুনতে পাচ্ছে।

‘তুমি থাকবে, না যাবে?’ ভোঁতা গলায় জিজ্ঞেস করল ফিজেরান্ড।

‘যাওয়াটা কি ঠিক হবে?’

‘তর্ক করতে চাই না। ইচ্ছে হলে থাকো। তবে ওদের হাতে পড়লে কি করবে সোঁটাও গুনে নাও। শরীরে পাইনের ডাল চুকিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে দেবে, যাতে ধীরে ধীরে পুড়ে মরো। কিংবা হয়তো জ্যান্ত রেখেই আস্তে আস্তে চামড়া ছাড়াবে। দেখাও ছেলে, এখনও বয়েস তোমার অল্প। একটা লাশের জন্যে এভাবে কষ্ট পেয়ে মরার কোন অর্থ হয় না। ভাল চাও তো চলো আমার সঙ্গে।’

জিমের মনে হলো তার শরীরটাই চলছে, সে নয়। অনেক ভারি লাগছে দেহটা।

‘ওর জিনিসগুলোও নিয়ে নাও,’ ফিজেরান্ড বলল।

বিশ্বাস করতে পারছে না জিম। হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

‘জলদি!’ ধমকে উঠল ফিজেরান্ড। ‘ছুরি, রাইফেল, সব নাও। কিছুই রেখে যাওয়ার দরকার নেই। এসব জিনিসের আর প্রয়োজন হবে না ওর।’ তবু জিম নড়ছে না দেখে কিছুটা নরম হয়ে বোঝানোর চেষ্টা করল, ‘ও মরে গেলে কি হত? জিনিসগুলো কি ওর সঙ্গে কবর দিতাম? নাও, নিয়ে নাও। ভাববে ও মরে গেছে। আমরা ওকে কবর দিয়ে চলে গেছি। কেউ জিজ্ঞেস করলেও এ-কথাই বলবে।’

বিলের দিকে সরাসরি তাকাতে পারছে না জিম। চোখের কোণ দিয়ে দেখল। মনে হলো, নড়তে চাইছে বিল। কিছু বলতে চাইছে।

ঘুরে দাঁড়াল সে। গিয়ে দাঁড়াল ঘোড়াটার কাছে।

মনে ঘোরের মধ্যে ঘোড়াটার পাশে পাশে হেঁটে চলল সে। কয়েক মাইল পর্যন্ত এগোল এভাবেই। তারপর প্রচণ্ড রেগে গেল। অসুস্থ বোধ করছে।

জিম আর ফিজেরান্ড চলে যাওয়ার পর আবার বৈঠশ হয়ে গেল বিল। কতদিন পর ঘুম ভাঙল বলতে পারবে না। ভাঙতেই চিৎকার করে ডাকতে গেল দুজনকে, ফিরে আসার জন্যে। কিন্তু ডাকল না। বুঝতে পারল, লাভ নেই, অনেক দেরি হয়ে গেছে।

গরম হয়ে আছে শরীর। পানির জন্যে অস্থির। জিভ শুকনো, ফুলে উঠেছে।

মৃত্যুর স্বাদ

গড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল ঝর্নার কাছে। তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল শরীরে। আবার বেইশ হয়ে যাচ্ছিল। থেমে বিশ্রাম নিতে নিতে ভাবল, কি ভাবে যাওয়া যায়। আরেকবার গড়ান দিল। দম আটকে আসতে চাইল ব্যথায়। উপুড় হয়ে মুখ ঝুঁজে দিল মাটিতে। কিছুক্ষণ ওভাবে পড়ে থেকে আবার এগোনোর চেষ্টা করল। গড়াতে গেলে বেশি ব্যথা লাগে, বুকে হেঁটে এগোল। অনেক, অনেকক্ষণ পর টের পেল, ভেজা মাটিতে ঠেকেছে ঠোঁট।

পানি খাওয়ার আর শক্তি নেই। ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙলে দেখল পানির কিনারে পড়ে আছে। মুখ বাড়াতাই পানির নাগাল পেল। যতটা পারল খেলো। তবে খেতে পারল খুব অল্পই। দেখল, ক্ষতগুলো থেকে আবার রক্ত পড়ছে। প্রতিটি জখমের ব্যথা আলাদা করে বুঝতে পারছে না। সমস্ত শরীরেই ব্যথা, এক রকম ব্যথা। আবার ঘুমিয়ে পড়ল সে।

ঘুম ভাঙল। এইবার খিদে টের পেল। ভালই। তার মানে সেরে উঠছে শরীর। কাছেই একটা ডাল থেকে রুলে আছে গোটা ছয়েক জাম। সেদিকে এগোতে শুরু করল সে। কয়েক গড়ান দিয়েই বুঝল, যেতে পারবে না। কাজটা আগামী দিনের জন্যে স্থগিত রেখে ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

পরদিন সকালে মাথা আরও পরিষ্কার হয়ে এল। প্রথমেই মনে পড়ল জামের কথা। গাছের গোড়ায় পৌঁছল। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল, পাড়বে কিভাবে? এক কাজ করা যায়। গাছের গোড়ায় শরীরের ভর দিয়ে চেপে নোয়ানোর চেষ্টা করতে পারে। তাতে ভেঙেও যেতে পারে গাঁছ।

ভেঙেই গেল গাছটা। কিন্তু এইটুকু পরিষ্কার করার পরই মনে হলো, শরীরের ওপর দিয়ে ঘোড়া দাবড়ানো হয়েছে। অনেকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে এগোল জামগুলোর দিকে। এক এক করে খেয়ে শেষ করে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। গাঢ় হলো না ঘুম। স্বপ্নে দেখল জিম আর ফিজেরান্তকে। চলে যাচ্ছে যেন ওরা। চলে যাওয়ার আগে ওদের কথাবার্তাও শুনতে পেল।

পরদিন সকালে জেগে উঠে মনে করতে পারল সে, কি ঘটেছিল তার। বিড়বিড় করে গাল দিল, 'কুত্তার বাচ্চারা! সব জিনিস নিয়ে গেছিস আমার, মরার জন্যে ফেলে গেছিস!'

সারাটা দিন কখনও ঘুমিয়ে, কখনও জেগে কাটাল। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলে ঠিক করল, এখান থেকে বেরিয়ে যাবে সে। শুধু যাবেই না, একটা বোঝাপড়াও করবে জিম ও ফিজেরান্তের সঙ্গে। উত্তেজিত হয়ে উঠতেই আবার যেন নতুন করে এসে শরীরে ঝাঁপিয়ে পড়ল ব্যথা।

কিছুক্ষণ পর ঘুম থেকে জেগে দেখে কাছেই অলস ভঙ্গিতে পড়ে আছে একটা র্যাটলস্নেক। একটা আঁস্ত পাখিকে গিলেছে। ফুলে আছে পেট। একবার দেখেই বুঝতে পারল, ওটাকে শেষ করতে খুব একটা ক্লিষ্ট হতে হবে না তাকে। হাতের কাছেই পাখর পড়ে আছে। একটা তুলে নিয়ে মাখায় কয়েক বাড়ি দিয়েই মেরে

ফেলল। ধারাল পাখরের সাহায্যে সাপের মাংস কেটে নিয়ে পানিতে চুবিয়ে চুবিয়ে খেলো। শক্তি ছড়িয়ে পড়তে লাগল শরীরে।

বেলা বাড়লে। গরম হয়ে উঠছে সব কিছু। গরম হচ্ছে শরীর। ভাবল, দেরি করে লাভ নেই। এখনই রওনা হবে ফোর্ট কিউয়ার উদ্দেশ্যে। ফোর্ট হেনরির চেয়ে ওটা কাছে। তাছাড়া যেতে হবে চালুর দিকে, উজানে হাঁটার চেয়ে সহজ। পানির কাছাকাছি থাকাই ভাল। পথ হারানোর ভয় থাকবে না, পানিও পাওয়া যাবে।

তাড়াহুড়ো করার কারণ, খাবার। যা খেয়েছে, সেটা হজম হতে দেরি হবে না। আবার পাখে কি পাখে না এখনো, জানা নেই। চলার মধ্যে থাকলে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। মোহম আছে। আরও শিকার পাওয়া যায়। একলা একজন মানুষ ডাকোটার এই অঞ্চলে বেঁচে থাকতে পারে, সঙ্গে যদি একটা রাইফেল আর একটা ছুরি থাকে। কিন্তু দুটোই নিয়ে গেছে হারামজাদারা! ঠিক আছে, হাল ছাড়বে না। আর কিছু যদি না-ই মেলে গাছের মূল খেয়েই বাঁচবে। পাউনিদের সঙ্গে বহুকাল বাস করেছে। বুন্দো এলাকায় কি করে টিকে থাকতে হয় জানে।

হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল সে। সাংঘাতিক দুর্বল শরীর। মনে হচ্ছে পিঠে করে একটা খঁচর বয়ে নিয়ে চলছে। দিনের অর্ধেক পেরোতে না পেরোতেই ক্লান্ত হয়ে নেতিয়ে পড়ল। নড়াচড়ায় খুলে গেছে আবার অনেক জখমের মুখ। রক্ত পড়ছে। চলতে চলতে দুই-দুইবার বেইশ হওয়ার পর্যায়ে চলে গিয়েছিল।

বিশ্রাম নিয়ে আবার চলতে লাগল সে। সারা দিনে এক মাইল পেরোল। নিজেকে সাহস দিল, অনেক এসেছে। আগামী দিন আরও বেশি পথ পেরোতে পারবে।

কিন্তু পরদিনও মাইলখানেকের বেশি এগোতে পারল না। তৃতীয় দিনে কিছুটা বেশি পারল বটে, কিন্তু বুঝল, এভাবে আড়াইশো মাইল পাড়ি দেয়া সম্ভব নয়।

দু-দিন পর খোলা প্রান্তর থেকে ভেসে এল নেকডের ডাক। কি ব্যাপার দেখার জন্যে হামা দিয়ে এগোল সে। দেখল একটা মোষের বাচ্চাকে ঘিরে ফেলেছে নেকডেরা। মেরে ফেলতে দেরি করল না। খাওয়ার জন্যে ছিড়তে শুরু করল। দেখে যেন খিদে আরও বেড়ে গেল তার। সব মাংস শেষ করে ফেলার আগেই জানোয়ারগুলোকে তাড়াতে হবে। কিন্তু কিভাবে তাড়াবে? হামা দিয়ে গিয়ে আর যা-ই করুক, নেকড়ে তাড়াতে পারবে না। বরং তাকে অসহায় দেখলে উল্টে আরও আক্রমণ করে বসবে ওগুলো।

ওয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল বিল। পেটে কিছুটা খাবার পড়তেই উন্মত্ত ভাব অনেকটা শান্ত হয়ে এল নেকড়েগুলোর। এইই সুযোগ। মরিয়া হয়ে উঠল সে। একটা লাঠি তুলে নিয়ে তাতে ভর দিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। মাথা ঘুরে উঠল। দুলে উঠে পড়তে গিয়েও পড়ল না, টলটলায়মান অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল কেবল অসাধারণ মনের জোরে। চিৎকার করে উঠল পাউনিদের মত করে। তীক্ষ্ণ এক

ধরনের চিৎকার। শিকারের ওপর ঝাপিয়ে পড়ার আগে একরম শব্দ করে ওরা। বহুবার দেখেছে বিল, এই শব্দে অনেক কাজ হয়। যাবড়ে যায় শিকার। তখন ওটাকে বাগে আনা সহজ হয়।

দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না সে। দুলছে। মনে হচ্ছে, সাগরের জীষণ চেউয়ে ভাসছে তার ডিঙি। তবে চিৎকারে কাজ হয়েছে। সরে গেল নেকড়েগুলো।

মোঘটার কাছে পৌঁছল সে। লাঠি ভর করে অনেক কষ্টে বসল। পড়ে যেতে চাইছে শরীর, কিন্তু এখন পড়তে দেয়া চলবে না। ঝাঁকুনি কিংবা টান লাগলে ক্ষতের মুখগুলো আরও বেশি খুলে যাবে। এত কষ্টের পর রক্তক্ষরণে মরতে চায় না। কয়েক মিনিটের বেশি বিশ্রাম নিল না। অনেকটা নেকড়েদের মতই মুখ নামিয়ে কামড়ে কামড়ে খেতে লাগল চাক চাক মাংস। মাথায় একটাই চিন্তা, আমি বাঁচব, আমি বাঁচব।

দিন কয়েক ওখানেই পড়ে রইল সে। রাতে ঘুমাল। দিনে খেলো। খিদে পেলে আর দেরি করে না। রক্ত, মাংস, যকৃত, ফ্রফপিও, নাড়ীভুঁড়ি, কিছুই বাদ দিল না। তার পরেও কিছুটা মাংস বেঁচে গেল। তবে সেটা আর খাওয়ার উপযুক্ত নেই। পচে গন্ধ ছড়াতে শুরু করেছে।

ওই জায়গা যখন ছাড়ল, তখন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে। হাঁটতে পারে। নিজেকে সমাট মনে হচ্ছে এখন। ঝোপের ওপর দিকে তাকাতে পারে। দেখতে পারে ওপাশে কি আছে। ভালুক কিংবা ইনডিয়ানদের আসতে দেখলে সতর্ক হতে পারবে। ভাগ্য ভাল হলে আর হাতের কাছে পেয়ে গেলে খরগোশ কিংবা অন্য কোন ছোট প্রাণী মেরে খেতে পারবে। মাথা তুলে দাঁড়াতে পারায় আরেকটা বড় সুবিধে হলো, সর্বক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হবে না একঘেয়ে খুসর ভেজা মাটির দিকে। দিগন্তের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত চোখে পড়ছে। আবার মানুষ মনে হচ্ছে নিজেকে, চতুষ্পদ জন্তু নয়।

অনেকটা শুকিয়েছে ক্ষতগুলো। ভরসা পাচ্ছে, পুরোপুরিই শুকাবে। কেবল পিঠের একটা জখম খুব বেশি। সেটার কি হবে বুঝতে পারছে না। ওখানে হাতও পৌঁছায় না ঠিকমত। যাই হোক, সারাদিনে এখন মাইল দশেক এগোতে পারবে। তিনটে ভাবনা এখন মাথায়: বেঁচে থাকতে হবে, ফোর্ট কিউয়াতে পৌঁছতে হবে, প্রতিশোধ নিতে হবে।

দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে, রী ইনডিয়ানদের চোখ এড়িয়ে, আরও নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে গিজলির সঙ্গে হাতাহাতির সাত সপ্তাহ পর অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ফোর্ট কিউয়াতে পৌঁছল সে। তাজ্জব করে দিল ফোর্টের পরিচালক কেইওয়া ব্র্যাজকে।

আসতে পেরে খুশি হয়েছে বিল, কিন্তু এতে তাজ্জব হওয়ার কিছু দেখল না সে। ইচ্ছে থাকলে একজন মানুষ অনেক কিছু করতে পারে। জানতে পারল, মনদন গায়ে একটা অভিযাত্রী দল পাঠাচ্ছে ব্র্যাজ। খবর পেয়েছে শান্তিপূর্ণ মনদনদের কাছ থেকে একটা গ্রাম কিনে নিয়েছে রী-রা। কথা দিয়েছে ওরা ভাল হয়ে যাবে।

www.boirboi.blogspot.com

খুনখারাপির মধ্যে আর যাবে না। ব্র্যাজু দেখল এই সুযোগ। দুটো গোত্রের সঙ্গেই মিলমিশ করে নিয়ে ফারের ব্যবসা চালাবে। শুভেচ্ছা সফর আর বাণিজ্যিক চুক্তি স্থাপনের জন্যে ছয় জনের একটা দল গড়েছে সে। দলপতি একজন ফরাসী, অ্যান্টনি সিটোলা। সঙ্গে যাবেন লুইস-ক্লার্ক, অভিযানের বিখ্যাত দলনেতা কারবোনা। যেতে ইচ্ছুক সপ্তম আরেকজনকে পেয়ে খুশিই হলো ব্র্যাজু। কিন্তু বিলের আচার-আচরণ সুবিধের মনে হলো না তার। কিছুটা অদ্ভুত। একটা মারাত্মক দুর্ঘটনা থেকে মরতে মরতে বেঁচে এসেছে, শরীর ভালমত সারাইনি, এখনই আবার বেরিয়ে পড়তে চায়! তবে এটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাল না সে। ইচ্ছে করে যেতে চাইছে যখন যাক।

নভেম্বরের চতুর্থ সপ্তাহে যাত্রা করল দলটা। নৌকায় করে জলপথে চলেছে ওরা। পথে হঠাৎ ঠিক করলেন কারবোনা, হেঁটে যাবেন। রীদের গ্রাম মনদনদের মাইলখানেক দক্ষিণে, আর মনদনের আরও কিছুটা উজানে টিলটন'স ফোর্ট। রীদের গায়ের পশিম প্রান্ত যুগে যুগে ফোর্টে চলে যাওয়ার ইচ্ছে তাঁর। অঘটনের আশঙ্কা করছেন তিনি। মনদনদের বিশ্বাস করেন তিনি, রীদের নয়। নৌকার মাঝিদের একথা বলতে তারা মুচকি হাসল। সিটোলারেরও ভয় ভয় করতে লাগল। তবে কারবোনা একাই তীরে নামলেন। পরদিন বিলও তাকে তীরে নামিয়ে দিতে বলল। দুটো গ্রাম থেকে খানিকটা দূরে নদীতে একটা বড় রকমের বাক আছে। সেখানে তাকে নামিয়ে দেয়া হলো। গ্রামবাসী ইনডিয়ান কিংবা ফোর্টের ভালমদ নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই। সে যেতে চায় ফোর্ট হেনরিতে। যত শটকাটে তাড়াতাড়ি যেতে পারে ততই ভাল।

কয়েক মাইল গিয়েই কয়েকজন ইনডিয়ান মহিলাকে চোখে পড়ল। তাকে দেখে চিৎকার করে বনে ঢুকে গেল ওরা। বিল বুকল, ওরা রী। তাকে ধরার জন্যে এল বলে পুরুষেরা। ছুঁতে লাগল সে। কিন্তু কয়েকটা জখম পুরোপুরি সারেনি। ভাল করে নোড়াতে পারল না। তীক্ষ্ণ চিৎকার করতে করতে তেড়ে এল কয়েকজন রী যোদ্ধা। আর বাঁচার আশা নেই। হাল ছেড়ে দিল বিল। ঠিক এই সময় উল্টো দিকে ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল। ছুটে এল আরেকদল অস্বারোহী ইনডিয়ান। ওরা মনদন। দ্রুত এসে বিলকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিল একজন। যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে ছুঁতে শুরু করল।

বিলের ভাগ্য ভাল, রীদের চিৎকার কানে গিয়েছিল মনদন যোদ্ধাদের। ওদের ওপর এমনিতেই খেপে আছে মনদনরা, মহাবিরক্ত। ভয় পাচ্ছে, রীদের শয়তানিতে ভীষণ রোগে গিয়ে প্রতিশোধ নিতে আসবে শ্বেতাঙ্গরা, তখনই করে দেবে সমস্ত ইনডিয়ান গ্রাম। বিলকে ফোর্টে পৌঁছে দিল ওরা। কারবোনা আগেই এসে বসে আছে। সেদিন বিলকে ফোর্টে খবর এল, সিটোলার দলকে নদীতেই ধরে জবাই করে ফেলে দিয়েছে রী-রা।

এসব খবর ঠেকাতে পারল না বিলকে। পরদিন সকালে উঠেই ফোর্ট

হেনরিতে রওনা হলো সে। নদীর পূর্ব পাড় ঘেঁষে চলল যেখানে রীদেবের সামনে পড়ার ভয় কম। আরও দুই জাতির দুর্ধর্ষ ইনডিয়ানের বাস ওই এলাকায়। অ্যাসিনিবোয়ানিস ও গ্ল্যাকফিট। তৃণভূমির বাসিন্দা গ্ল্যাকফিটেরা তো শ্বেতাঙ্গদের ভ্রাস।

প্রচণ্ড তুষারপাত শুরু হলো। জমে গেল এক ফুট পুরু হয়ে। মিসৌরির এই অঞ্চলে গাছপালা নেই বললেই চলে, মাইলের পর মাইল শুধু তৃণভূমি। ফলে কোথাও বাধা না পেয়ে আরও উগ্রও ও বেপরোয়া হয়ে ওঠে ঝড়ো বাতাস। বয়ে যায় শাই-শাই শাই-শাই। কোন কিছুকেই পরোয়া করল না বিল। এগিয়েই চলল। দুর্ঘোষণে ভরা দিন আর ভয়াবহ ঠাণ্ডা অনেকগুলো রাত কাটিয়ে, তিনশো মাইল পথ পাড়ি দিয়ে প্রায় তিন সপ্তাহ পর ঠিকই এসে হাজির হলো ফোর্ট হেনরিতে। কিন্তু দুর্গের কাছাকাছি পৌঁছেই টের গেল, কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। খুব সাবধানে কাছে এসে উঁকি দিয়ে দেখল যেরোফেরা করছে কয়েকজন সিউজ ইনডিয়ান। এরা খুনখারাপির মধ্যে সাধারণত যেতে চায় না, শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে মোটামুটি সম্পর্ক ভাল। তাদের কাছে জানতে পারল বিল, গ্ল্যাকফিটদের অত্যাচারের টিকতে না পেয়ে দলবল নিয়ে দুর্গ ত্যাগ করে বিগ হর্নে চলে গেছেন হেনরি। ওখানে যেতে হলে যতটা এসেছে সে আরও ততটা যেতে হবে উজানের দিকে। কুছ পরোয়া নেই। রওনা হয়ে গেল বিল।

১৮২৩, ৩১ ডিসেম্বর রাতে দুর্গে বসে নিউ ইয়ার উদযাপন করছেন অ্যান্ড্রু হেনরি। গ্ল্যাকফিটদের এলাকা থেকে বহুদূরে ক্রো-দের এলাকায় চলে এসেছেন। ক্রো-রা ভাল। তাদের সঙ্গে ভাব করে নিয়ে ফার জোগাড়ের ব্যবস্থা করেছেন। এলাকাটো ভাল। সর্বক্ষণ খুনে ইনডিয়ানদের ভয়ে তটস্থ থাকতে হবে না। প্রচুর মােষ আছে তৃণভূমিতে। দীর্ঘ শীত কাটাতে অসুবিধে নেই। ফলে মন ভাল সবারই।

বাইরে গর্জন করে কিরছে তুষার মেশানো কনকনে ঝড়ো হাওয়া। এই সময় দুর্গের দরজায় ঘন ঘন করণাঘাতের শব্দ হলো। কে থাবা দেয় এই অসময়ে? অবাক হয়ে দরজা খুলে দিল দ্বাররক্ষী। নিজের চোপকে বিশ্বাস করতে পারল না। দাঁড়িয়ে আছে বিল ডেনভারের ভূত! লম্বা লম্বা চুল, দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল, তুষারে ছাওয়া। পরনের চামড়ার পোশাকে পুরু হয়ে জমে থাকা তুষার শক্ত হয়ে গেছে।

সোজা এসে হলরুমে ঢুকল বিল, যেখানে আনন্দ করছে দুর্গের সমস্ত লোক। স্তব্ধ হয়ে গেল কোলাহল। ঘোষণা করল সে, 'আমি বিল ডেনভার। ফিজেরাল্ড আর ব্রিজারের খোঁজে এসেছি। কোথায় ওরা?'

চুল বে দেখছে না নিশ্চিত হওয়ার জন্যে একজন এগিয়ে এসে ছুঁয়ে দেখল বিলকে। অন্যেরা যিরে এল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুরু হলো। ওসবের জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না সে। বলল, 'ফিজেরাল্ড আর ব্রিজার আমাকে ফেলে এসেছে মরার জন্যে। আমার রাইফেল আর জিনিসপত্র সব নিয়ে এসেছে। বাঁচার

www.boiRboi.blogspot.com

জন্যে কী না করেছে আমি। কিউয়াতে গেছি। সেখান থেকে মনন্দ, তারপর থেকে খুঁজতে এসেছি এখানে। কোথায় ওরা?'

হেনরি জানালেন, ফিজেরাল্ড চলে গেছে। সত্য এলাকায় ফিরে যাবে। অ্যাগলির কাছে দুর্গ বদলের খবর নিয়ে গেছে গ্ল্যাক হ্যারিসের দল। তাদের সঙ্গে গেছে সে। ক্যানোতে করে নদীপথে ভাটির দিকে।

'বিজার কোথায়?' জিজ্ঞেস করল বিল। 'নিগারের বাচ্চাটা?'

হাত তুলে নীরবে খবর কোণে দেখালেন হেনরি।

চেয়ারের মধ্যে যেন ডুবে যেতে চাইছে বিজার। জড়সড় হয়ে বসে আছে। বিলকে দেখে পাথর হয়ে গেছে। কল্পনাই করতে পারেনি জ্যাণ্ড হয়ে উঠে আসবে আবার কোন লাশ।

দুর্গম হাজার মাইল পথ পেরিয়ে এসেছে যার সন্ধানে তার দিকে ভাল করে তাকা বিল। বিষণ্ণ চেহারার এক নিরোঁ তরুণ। বড় বেশি ছেলেমানুষ। এরই জন্যে এত কষ্ট করে এত পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে? কি প্রতিশোধ নেবে ওরকম একটা বাচ্চাছেলের ওপর! পরক্ষণেই কঠোর করে তুলল মনকে। ব্যেসন যাই হোক, শাস্তি ওকে পেতেই হবে। পার্বত্য এলাকার আইন লঙ্ঘন করেছে সে। অসহায় অবস্থায় সঙ্গীকে একা ফেলে পালানোর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

হাত নেড়ে জিমকে উঠে আসতে ডাকল বিল।

কুণ্ঠিত পায়ে কাছে এসে দাঁড়াল জিম।

'তোমাকে আমি এখন খুন করব,' বিল বলল, 'ঝুতে পারছ সেটা?'

'করুন। আপনার যা ইচ্ছে করুন। অনুশোচনায় জলে-পুড়ে মরছি আমি। একটা মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ সেই। যেন ভুতে তাড়া করে ফেরে সারাক্ষণ।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বিল। ধীরে ধীরে বলল, 'আমাকে মরার জন্যে ফেলে এসেছিলে তুমি। জিনিসপত্র লুট করে এনেছ। রাইফেল আর ছুরিটাও রেখে আসোনি, তাহলেও আমার অনেক সুবিধে হত। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাহিল হয়ে মাইলের পর মাইল হামাগুড়ি দিয়েছি, অস্বর্গনীয় যন্ত্রণা সহ্য করেছি, আর বার বার প্রতিজ্ঞা করেছি তোমাদেরকে নিজের হাতে খুন করব আমি। কিন্তু ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে আর ইচ্ছে করছে না এখন। নিজের ডুলও যখন বুঝতে পেরেছি, যাও, দিনলাম মাপ করে।'

কিন্তু প্রাণভিক্ষা পেয়েও স্তব্ধ নিঃশ্বাস ফেলল না জিম। কোনরকম ভাবান্তর হলো না চেহারায়। টলতে টলতে ফিরে গেল নিজের জায়গায়। অসুস্থ বোধ করছে।

অনেকখানি হালকা হয়ে গেল বিলের মন। ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে। একজন একটা ছুরিস্থির গ্রাস এনে ধরিয়ে দিল তার হাতে। কিন্তু দুই চুমুকের বেশি দিতে পারল না তাতে। জ্ঞান হারাল।

পরদিন সকালে জেগে উঠে প্রথমেই ফিজেরাল্ডের কথা মনে পড়ল তার। পিছু

নেয়ার কথা ভাবল। কিন্তু আগের মত প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছেটা নেই আর। দিন কয়েক ওই দুর্গেই ওয়ে-বসে কাটাল সে। বাইরে প্রচণ্ড তুষারঝড়। এই আবহাওয়ায় বেরোতে ইচ্ছে করল না।

তবে ফিজেরাল্ডকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে বের করেছিল বিল। এর জন্যে আরও কয়েকবার দুর্গম অঞ্চল পাড়ি দিতে হয়েছে তাকে। কয়েকবার খুনে ইনডিয়ানদের কবলে পড়ে মরতে মরতে বেঁচেছে। কিন্তু ফিজেরাল্ডের মুখোমুখি দাঁড়াল এসে একদিন।

তবে তাকেও মারেনি বিল। জিমের মতই মাপ করে দিয়েছে।

খুনের পাহাড়

এবড়োখুবড়ো পাহাড়ী পথে ঝাঁকুনি খাচ্ছে স্টেশন ওয়াগন। কিমুনি এসে গিয়েছিল, জোর এক ঝাঁকুনিতে তন্দ্রা ছুটে গেল, সোজা হয়ে বসে বাইরে তাকালাম। কোন পরিবর্তন নেই, সেই একই রকম রয়েছে মরুভূমি, শুধু সামনের দিগন্তরেখার কাছে যে কালো ছায়াটা ছিল, সেটা স্পষ্ট হয়ে একটা পাহাড়ে রূপ নিয়েছে।

‘সামনেই রানাগাট, এই আর মাইল তিন-চারেক হবে,’ বলল পাশে বসা ড্রাইভার হ্যারিস, চ্যাপ্টা মুখ, বাঁ হাত স্টিয়ারিংয়ে। ‘খুব কাছে না এলে শহরটা দেখতে পাবেন না।’

‘মেসটার কাছে?’

‘ওটার পাশেই আরেকটা পাহাড়ের চূড়ায়। খুবই ছোট শহর, লোকসংখ্যা চারশো মত, তা-ও ওদের অনেকেই থাকে বাইরে। হাইওয়ে থেকে অনেক দূরে রানাগাট, তাছাড়া ওখানে দেবার কিছু নেই। টুরিস্ট আসে না। আপনিই এলেন।’

‘এসব খনি-শহরগুলোর তো এককালে ভীষণ বদনাম ছিল। এটার কি অবস্থা?’ এটারও ছিল। পাঁচাত্তরজনকে গুলি করে কিংবা ফাঁসি দিয়ে মারার পর তাগ্ত হয়েছে।’

‘খুব খারাপ জায়গা!’

‘এখনও ভাল হয়নি পুরোপুরি। এই তো দিন কয়েক আগে মারা গেল এক বুড়ো। টাকার কুমির ছিল লোকটা, কিন্তু কিপটে কাকে বলে!’

‘খুন?’

‘তাছাড়া আর কি? কে খুন করেছে জানা যায়নি, তবে ভয়ের কিছু নেই। শিগগিরই ব্যাটাকে ধরে ফেলবে পণ্ড। আরে, ওই ওয়াল্ট পণ্ড, শেরিফ। বয়েস হয়েছে এখন, শরীরে আগের সেই ক্ষমতা আর নেই, তবুও চালিয়ে নিচ্ছে কোনমতে। পুরানো আমলের কাউবয়দের মত পোশাক পরে, কোমরে পিস্তল ঝোলায়। আগে থেকে জানা না থাকলে হঠাৎ দেখলে চমকেই উঠবেন। সেই ওয়াইল্ড ওয়েস্টের কথা মনে করিয়ে দেয় লোকটা।’

ঠোটে সিগারেট লাগাল হ্যারিস। এক হাত স্টিয়ারিংয়ে, অন্য এক হাতেই দিয়াশলাইয়ের কাঠি জেলে বেশ কায়দা করে ধরিয়ে ফেলল সিগারেট। ‘কিপটে বুড়োটার নাম ছিল রট হ্যানসন।’ দু-আঙুলে ধরা সিগারেটের জুলন্ত মাথাটা দিয়ে

বাতাসে খোঁচা মারল সে, মেসার দিকে নির্দেশ করল, 'ওখানে বাস করত।'

'চূড়ায়?' লাল মাটির তৈরি যে পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছি, ওটাই মেসো। চূড়াটা বিরাট ছুরি দিয়ে কেটে ফেলে দিয়েছে যেন কেউ, টেবিলের মত সমতল। কিন্তু যেরকম খাড়া, কোন মানুষের পক্ষে গা বেয়ে ওঠা অসম্ভব। 'কি করে উঠত?'

'মজাটাই তো ওখানে, মিস্টার। একটাই মাত্র পথ রয়েছে ওঠার, রানাগাটের দিকে সেটা। ওখান দিয়ে যে-ই উঠুক, বুড়ো অ্যালেন কিনির চোখ এড়িয়ে উঠতে পারবে না। পাহাড়ের গা গভীর করে কেটে তৈরি হয়েছে পথটা, পাশেই পড়বে বুড়োর কেবিন। শকুনের মত চোখ ব্যাটার, কয়োটার মত ধূর্ত। আরও মজা কি জানেন, ওই দুই বুড়ো ছিল পার্টনার, খনির ব্যবসা এক সঙ্গেই শুরু করেছিল ওরা, তাই কাছাকাছি কেবিন বানিয়েছে। কোম্পানির নাম ছিল হ্যানসন অ্যাণ্ড কিনি। শুরুতে ডালই চলছিল, টাকাও কামাচ্ছিল, হঠাৎ একটা গোলমাল বাধল দু-জনের মধ্যে, আলাদা হয়ে গেল।'

'কিনি খুন করেছে হ্যানসনকে?'

'কেউ কেউ তাই ভাবছে। তবে অনেকে অন্য কথাও বলছে। হ্যানসনের এক ভাণ্ডি আছে, সুন্দরী, নাম ডিকসি। চাচাকে দেখতে এসেছে রানাগাটে। ও আসার দু-দিন পরেই খুন হলো বুড়ো। হ্যানসনের সমস্ত সম্পত্তি আর টাকার মালিক হবে ওই ডিকসি, কাজেই...' থেমে গেল হ্যারিস।

তারমানে, সন্দেহভাজন এখন পর্যন্ত হলো মোট তিনজন: আলেন কিনি, ডিকসি হ্যানসন, আর আমার মঞ্চল। 'আচ্ছা, লেভিট নামে কাউকে চেনো?'

'স্টার লেভিট? চিনি!' চোখের কোণ দিয়ে একবার আমার মুখ দেখে নিল হ্যারিস। আমি কি উদ্দেশ্যে রানাগাটে এসেছি অনুমানের চেষ্টা করছে, পারছে না। 'ওকে চেনেন আপনি?'

'নাম শুনেছি।' আমি কেন এসেছি এখানে, হ্যারিসকে বলার প্রয়োজন মনে করলাম না। যতটা পারি খবর বের করে নেব, নিজে যা জানি বলব না।

'ওকেও সন্দেহ করা হচ্ছে,' বলল হ্যারিস। 'আপনাকে বলি, মিস্টার, লোক সে সুবিধের নয়। ওর সঙ্গে ব্যবহার খারাপ করেছেন কি মরছেন। ওর সম্পর্কে কেউ তেমন কিছু জানে না, অথচ রানাগাটে দশ বছর ধরে আছে লোকটা। আপনার কাজ যদি ওর সঙ্গে থাকে, সাবধান! খুব সাবধানে কথা বলবেন!'

'ওকেও সন্দেহ করা হচ্ছে কেন?'

'কারণ আছে। বুড়ো হ্যানসনের সঙ্গে বেধে গিয়েছিল তার। কি নিয়ে কেন তর্কাতর্কি হয়েছিল, লেভিট নিজে ছাড়া আর কেউ জানে না। কাউকে বলেনি। জয়া খেলে, প্রচুর টাকা আছে, এ-শহরের সবচেয়ে ডাল বাড়িটা তার। কালেভদ্রে কেউ দেখা করতে যায় তার সঙ্গে। বেশির ভাগ সময় একা একা ঘরে বসে থাকে। জানেন বোধহয়, এই পশ্চিম অঞ্চলে চেহারা আর শরীর দেখিয়ে কাউকে ভোলানো যায় না, এমন কি লেভিটের মত চেহারা হলেও নয়। তাই প্রথম প্রথম যখন

রানাগাটে এল সে, লোকে পাঠাই দিল না। তারপর একদিন গ্রিজলির সঙ্গে লেগে গেল তার। গ্রিজলি ভেনার, খনির শ্রমিক। নামের সঙ্গে শরীরের যথেষ্ট মিল, ভালুকই বটে। চ্যালেঞ্জ করে বসল ওরা একে অন্যকে। সেনুলনের বাইরে খোলা জায়গায় চলে গেল। তারপর যা একখান লড়াই হলো না, কি বলব আপনাকে। পাক্কা তিরিশ মিনিট পর হাল ছেড়ে দিল গ্রিজলি। চেনা যায় না আর তখন ওকে, এমন পিটুনি খেয়েছে! আরেকটু হলে মরে যেত!'

'লেভিটও নিশ্চয় আরেকটা গ্রিজলি?'

'না, ভেনারের মত লম্বা নয়, আপনার চেয়েও ইঞ্চিখানেক কম হবে। তবে প্রস্তু ছোটখাটো একখান হাতি, ঘরের দরজা দিয়ে ঢুকতে কষ্ট হয়। চর্নি নই গায়ে। যা আছে সলিড...' অস্বাভাবিক দিকে ফিরল হ্যারিস। 'আপনার ওজন কত? একশো আশি? পঁচাত্তিশ?'

'দু-শোর বেশি।' লেখা সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ।

'তাই? আপনিও তো অর্ধেক লোক, সাহেব। দেখে কিন্তু বোঝা যায় না। হাড্ডির ওজন বোধহয় খুব বেশি আপনার। যা-ই হোক, তা-ও সাবধান করে দিচ্ছি, লেভিটের সঙ্গে লাগতে যাবেন না। পারবেন না।'

আমার বসের কথা মনে পড়ে গেল। বস আমাকে বলেছে, খুব সাবধান, বুঝলে, সাংঘাতিক লোক ওই স্টার লেভিট। ভীষণ ধূর্ত। প্রচুর বদনাম তার। গায়ে যেমন জোর, মাথাটাও পরিষ্কার। ওখানে গিয়ে খোঁজখবর করো, তদন্ত করো, ও যে খুন্সী নয়, পারলে প্রমাণ করে দিয়ে এসো সেটা। কিন্তু বেশি ঝুঁকি নিতে যেনো না, যত টাকাই দিক। সব সময় একটা চোখ রাখবে ওর ওপর। কুগারকে বিশ্বাস করা যায়, তবু ওকে নয়।

জোরে আরও কয়েকটা ঝাঁকুনি দিয়ে যাত্রা শেষ করল স্টেশন ওয়াজন। ধূসর পাথরে তৈরি একটা বাড়ির সামনে থামল। পুরানো সাইনবোর্ড দেখে বোঝা গেল, বাড়িটা হোটেল। রেকর্ডেস্টও অবশ্যই আছে।

শহরের একটা মাত্র মেইন রোড, দু-দিকে দু-বার চোখ বোলালেই পুরোটা দেখা হয়ে যায়। পথের পাশে দুটো স্যালুন, একটা গ্যারেজ, একটা কামারশালা, তিনটে স্টোর, আর একটা কাফে। আর আছে গোটা দুই বসতবাড়ি, লোকে ভাড়া থাকে। ওগুলোর পর পথের শেষ মাথায় আরেকটা পাথরের বাড়ি—জেলখানা এবং শেরিফের অফিস।

গাড়ি থেকে আমার ব্যাগটা রাস্তায় নামিয়ে রাখল হ্যারিস, তারপর হাত পাতল। 'তিন ডলার ভাড়া।'

ওর ডাব-ভস্টিতেই বুঝতে পারলাম, আমার ওপর অসন্তুষ্ট। সারাটা পথ সে-ই কেবল বকবক করেছে, আমি চুপ। আমি কে, কেন এসেছি, কিছুই আন্দাজ করতে পারিনি, রাগটা তার সে-জন্মেই।

গাড়ি বারান্দায় বসে আছে দু-জন লোক। দু-জনেরই চোখা চিবুক, সারা মৃত্যুর স্বাদ

গায়ে মাটি আর ময়লা, যেন একেকটা ভূত। নিশ্চয় খনিজ-সন্ধানী। কি যেন চিবুচ্ছে। কৌতুহলী অলস চোখে আমার দিকে তাকাল ওরা।

হোটেলের লম্বা লবি। একপাশে বড় একটা ঘর, সৈতসৈতে, ফায়ারপ্লেনের ওপরে আর আশপাশে কালিঝুলি। একধারে গোটা পাঁচেক বড় বড় চেয়ার আর একটা সোফা, গদিটা কালো চামড়ায় মোড়া। পঞ্চাশ-ষাট বছর বয়স হয়েছে ওগুলোর। দেয়ালে বসানো একটা কুগারের মাথা, পোকা ধরে নষ্ট করে ফেলেছে।

পুরানো ডেক্সের ওপাশে নড়বড় একটা চেয়ারে বসে আছে এক প্রৌঢ়। প্রায় পঁচিশ বছর আগে হোটেলটা যখন খোলা হয়েছিল তখন থেকেই এর কেরানি সে। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ান। ঠেলে দেয়াল ডেক্সের ওপরে রাখা রেজিস্টারটা।

রেজিস্টারে নাম সই করে, চাবি নিয়ে দোতলায় উঠে এলাম। ঘরে ঢুকে ব্যাগ খুলে বের করলাম ৪৫ ক্যালিবারের কোল্ট পিস্তলটা। ব্যাগটা ঠেলে দিলাম খাটের নিচে। শার্টের তলায় কোমরে পিস্তল গুঁজে নিয়ে বেরিয়ে এলাম আবার ঘর থেকে। রঙনা হলাম শেরিফের অফিসে।

প্রধান রাক্তা ধরে দুটো ব্লক পেরোতে না পেরোতেই শহরের অধিবাসীদের প্রায় সবার কাছে চেনা হয়ে গেল আমার চেহারা।

রোল-টপ ডেক্সের ওপর পা তুলে দিয়ে আধশোয়া হয়ে আছে ওয়াল্ট পুণ্ড, বুকের ওপর আড়াআড়ি রেখেছে দু-হাত। চ্যাপ্টা চূড়াওয়ালা হ্যাটটা মাথার পেছনে ঠেলে দেয়া। হ্যাটের মতই ধবধবে সাদা তার চুল আর গৌক্ষ। কাউবয় বূট পায়ে—সোলের নিচে কাঁটা বসানো, কোমরের বেলেটে মুখ খোলা হোলস্টারে গুঁজে রেখেছে পুরানো ধাঁচের ছ'যরা রিভলভার।

পরিচয়-পত্র বের করে শেরিফের চোখের সামনে মেলেন ধরলাম। চোখ দুটো শুধু নড়ল তার, আমার ছবিটা দেখল। চোখ তুলল আবার। 'প্রাইভেট ডিটেকটিভ! কে ডেকেছে?'

'লেভিট।'
'ভাবনা-চিন্তা করছে তাহলে। এখানে কি করার ইচ্ছে, খোকা?'

'খুনের তদন্ত। ঘুরব-ঘাবব, খোঁজখবর করব। লেভিটকে সন্দেহমুক্ত করে আপনাকে ছাড়িয়ে নেব তার লেজ থেকে।' শেরিফের মুখ থেকেও তথ্য আদায়ের চেষ্টা চালানো, 'সুনলাম, এখানে কাউকে বিশ্বাস করে না সে। তার জেল হলো কি ফাঁস হলো, তাতে কারোই কিছু এসে যায় না। কোন বন্ধু নেই এখানে।'

'ঠিকই জানানো হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। ভাল পোকার খেলে। হারলে সঙ্গে সঙ্গে টাকা মিটিয়ে দেয়, জিতলে আদায় করে নেয়, মাঝেসাঝে খুব কড়া মদ খেয়ে নেশাও করে। ব্যস। আইন-বিরুদ্ধ নয় এসব। তবে খনির মালিকরা প্রায়ই এসে নালিশ করে আমার কাছে। সোনা চুরিতে নালিশ তার হাত আছে। সোনার খনি থেকে সোনা চুরি হবেই, দুনিয়ার কেউ কেউখাও ঠেঁকাতে পারেনি, আমি কি করে পারব?'

আমার মুখের দিকে তাকাল পশু। 'জানো বোধহয়...তুমি করে বলে ফেললাম, কিছু মনে করো না, এখানে ডুমিটাই বেশি চালু...যাই হোক, সব খনিতেই একটা বিশেষ ঘর থাকে, যেখানে কাজে যাওয়ার আগে কাপড়-চোপড় খুলে বিশেষ পোশাক পরে নেয় শ্রমিকেরা। খনি থেকে ফিরে পুরো উলঙ্গ হয়ে গোসল সারে, তারপর যার যার কাপড় পরে বেরোয়। যথেষ্ট কড়াকড়ি থাকে, তার পরও সোনা চুরি যায়। কোন না কোন ভাবে বের করে নিয়ে আসেই। আনার মধ্য ক্রেতা লাগে, চোরাইই ভাল কেনার জন্যে মহাজ্ঞান দরকার হয়। খনি-মালিকদের ধারণা, এখানে সেই মহাজ্ঞানটি হলো স্টার লেভিট।'

'তাকে জানিয়েছেন সে-কথা?'

'না। কোন প্রমাণ ছাড়া বলতে গেলে ফালতু কথা হয়ে যাবে।'

'ওই খুনের ব্যাপারে আপনার কি ধারণা? কোন সূত্র পেয়েছেন?'

বুকের ওপর থেকে হাত সরাল শেরিফ। 'দাঁড়িয়ে আছ কেন? বসো। চেয়ার টেনে নাও...না না, ওখানে নয়, আরেকটু বাঁয়ে সরে বসো। পিকদানির কাছ থেকে দূরে থাকো, নইলে থু-থু পড়বে গায়ে।'

নীর্বে কয়েক মিনিট তামাক পাতা চিবালা শেরিফ। থুক করে থু-থু ফেলল পিকদানিতে। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, যে বড়োটা খুন হয়েছে তার নাম রুট হ্যানসন, প্রচুর টাকার মালিক ছিল। মাথামোটা, খুব খারাপ ব্যবহার করত মানুষের সঙ্গে। বাস করত ওই মেসার মাথায়। বয়েস অনেক হয়েছিল, সত্তর, তবু শরীর-স্বাস্থ্য ভাল ছিল। মেরে না ফেললে আরও বিশটা বছর কাটিয়ে দিতে পারত অনায়াসে।'

আবার তামাক মুখে ফেলে চিবালা শেরিফ। থু-থু ফেলে বলল, 'গত সোমবার সকালে বুড়োর লাশ প্রথম দেখল তার ভাতি ডিকসি। সম্ভবত, রোববার রাতে কোন এক সময় খুন করা হয়েছে। টেবিলে বসেছিল, পেছন থেকে তিনবার ছুরি মারা হয়েছে পিঠে।'

'রোববার রাতে মেসায় উঠেছিল দু-জন, ডিকসি হ্যানসন আর স্টার লেভিট। মেয়োটা বলছে, বিকেল পাঁচটায় চাচার সঙ্গে কথা বলেছে সে। খানিকক্ষণ কথা বলে নেমে এসেছে শহরে। লেভিট উঠেছিল এই আটটার দিকে—আলো তখনও ছিল—শেষ পর্যন্ত রটের বাড়িতে ঢোকেনি সে, কোন কারণে মন পাটে দেখা না করেই ফিরে এসেছে।'

'তৃতীয় আরেকজন যাকে সন্দেহ করা যায়, সে অ্যালেন কিনি। ধাড়ি শকুন, রটের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করত সুযোগ পেলেই, গত চারটা বছর ধরে একজন আরেকজনকে সহ্যই করতে পারত না।'

'মেসার চূড়ায় ওঠার পথের পাশেই কিনি শকুনটার কেবিন, সারাক্ষণ চোখ মেলে রাখে, কান খাড়া। পাশের পথ দিয়ে একটা বেড়াল গেলেও তার চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না। ডিকসি আর লেভিটকে সে-রাতে রটের কেবিনের দিকে যেতে দেখেছে কিনি, কসম খেয়ে বলেছে, আর কেউ যায়নি। রানাপাটে যাকে খুশি

জিজ্ঞেস করো, একবাক্যে বলবে: বুড়ো কিনির চোখ এড়িয়ে স্বয়ং শয়তানও মেসায় উঠতে পারবে না। সে-রাত্তে সে রটের কেবিনে গিয়েছিল কিনা জিজ্ঞেস করছে। নাক বাকিয়ে মুখ বিকৃত করে বলল, গত ছ-বছর মেসায় চড়েনি সে, একবারও না।

‘তিনজনই খুনের মোটিভ রয়েছে, তিনজনইই সুযোগ ছিল পেছন থেকে রটের পিঠে ছুরি বসানোর। তবে মেয়েটাকে বেশি সন্দেহ হয় আমার। তিনজনই মধ্যে তার পক্ষেই কাজটা সবচেয়ে সহজ ছিল।’

বললাম, ‘লেডিট ঢুকলে ভাল হত। হ্যানসনকে যদি তখনও জীবিত দেখত, সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারতেন মেয়েটাকে।’

মাথা ঝাঁকাল শেরিফ। ‘তা পারতাম। কিন্তু লেডিট বলেছে, সে ঢোকেনি। এটা প্রমাণ করতে পারছি না আমরা। এসেছ, ভালই হয়েছে। কে অপরাধী, বের করতে পারো কিনা শুধু দেখো, ধরার জন্যে ভেব না, সে-জন্যে আমরাই আছি। সাহায্য পাবে।’ আরও খানিকটা তামাক মুখে ফেলল পণ্ড। চিবাতে চিবাতে বলল, ‘এসেছ তো লেডিটের পক্ষ নিয়ে... যদি দেখে সে-ই দোষী, তখন কি করবে?’

ঘুরিয়ে জবাব দিলাম, ‘আমাদের ফর্মের একটা সুনাম আছে। ত্যথ গোপন করে নির্দোষকে ফাঁসাই না আমরা, দোষী হলে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করি না। যদি বুঝতে পারি, মক্কেল নিজেই দোষী, তার সঙ্গে আমাদের চুক্তি শেষ।’

‘হুঁ!’

‘বুন্টা কোথায় হয়েছে দেখতে পারব?’

‘পারবে,’ ডেক্সের ওপর থেকে পা নামাল শেরিফ, উঠে দাঁড়াল। ‘চলো, আমিও যাচ্ছি। নইলে উঠতেই দেবে না তোমাকে কিনি বুড়োটা।’

পথটা বেয়ে কয়েক মিনিট উঠার পরই বুঝতে পারলাম, কান খাড়া কিংবা চোখ খোলা রাখার দরকার নেই কিনির। যদি সে কালো কিংবা অন্ধ না হয়, তাহলে একটা ইঁদুর এ-পথে গেলেও টের পাবে, এতই সরু পথ। তার ওপর কাঁকর আর পাখরের ছড়াছড়ি, শব্দ হবেই। পথ ছেড়ে দু-কদম সরলেই হোঁয়া যায় বুড়োর কেবিনের দেয়াল।

আমাদের সাড়া পেয়ে দরজায় এসে দাঁড়াল কিনি। লম্বা, হালকা-পাতলা শরীর, চৌকো চোয়াল, পাকানো লম্বা গৌফের ডগা জুলফি ছুঁই ছুঁই করছে। শেরিফকে জিজ্ঞেস করল, ‘ছোকরাটি কে?’

‘ডিটেকটিভ। খুনের তদন্ত করতে ওকে ডেকে এনেছে লেডিট।’

‘হুঁ, আরও শিওর হলাম, ব্যাটা নিজেই ক্রিমিয়াল।’

পিছিয়ে গিয়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল কিনি।

হাসল পণ্ড। ‘বুড়ো হ্যানসনও ঠিক এমনই খারাপ ব্যবহার করত। নাহলে কি আর বন্ধুত্ব হয়। তবে শেষ পর্যন্ত নিজেরাও নিজেদের সহ্য করতে পারল না।’

একেকটা শকুন পাঁচ লাখ ডলারের মালিক, ভাবতে পারো? একটা তো মরেছে, কিপটেমি করে করে টাকা জমিয়েছে, সেটা এখন ভোগ করবে একটা মেয়ে।’

‘বংশে আর কেউ নেই?’

‘আছে, কিন্তু এখন কোথায় কে জানে। তার এক ভাগ্নে। শুনেছি অ্যানিমেল ক্যাচার, জন্তু-জানোয়ারের ব্যবসা করে। বন থেকে ধরে এনে বিভিন্ন চিড়িয়াখানায় বিক্রি করে। সার্কাসের খেলাও দেখায়।’

‘মামার মৃত্যুর খবর শুনে জানানোর চেষ্টা করেননি?’

‘করেছি। নিউইয়র্কের একটা ঠিকানা খুঁজে বের করেছি। ওরা জানাল, সে নাকি এখন জন্তু-জানোয়ারের খেলা দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। এই মুহূর্তে কোথায় আছে, বলতে পারল না।’

‘আরও খোঁজ নিলে ভাল হত না? এখানেই আশেপাশে কোথাও যদি থেকে থাকে? থাকতে পারে না?’

মুখ তুলল শেরিফ। ‘আমার দিকে তাকিয়ে রইল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল, ‘তাই তো, একথাটা তো ভাবিনি। সত্যিই, বুড়ো হয়ে গেছি আমি। দাঁড়াও, আজ রাতেই লোক লাগাব।’

‘মেয়েটা কি হ্যানসনের সব টাকা পাবে? নাকি একটা অংশ?’

‘জানি না। মেয়েটা বলছে, সে-ই সব পাবে। তার চাচার সঙ্গে নাকি কথা হয়েছিল। চাচা বলেছিল, সব কিছু ডাক্তির নামে দিয়ে যাবে। ভাগ্যেই হয়তো দেখতে পারত না হ্যানসন। উইলটা এখনও দেখিনি, আগামীকাল খোলা হবে।’

প্রায় খাড়া হয়ে উঠে গেছে সরু পথটা। দু-ধারে বিক্ষিপ্তভাবে ঘাস জন্মেছে, তারই মাঝে মাঝে জুনিপারের ঝোপ। আরও প্রায় আধমাইল চলার পর কেবিনটা দেখতে পেলাম।

চূড়ার একধারে একেবারে কিনারা ঘেঁষে তৈরি হয়েছে বাড়িটা। একপাশ থেকে খাড়া বেমে গেছে পাহাড়। পেছনে একটা পাথুরে বেসিন, প্রাকৃতিক, বৃষ্টি হলে নিচয় পানি জমে ওখানে।

পাথরের বাড়িটা খুব যত্ন করে তৈরি করা হয়েছে। মোট তিনটে কামরা। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। যেখানে যে জিনিস রাখা দরকার ঠিক সে-ভাবেই রাখা হয়েছে। এক জায়গায় কিছু বই আর ম্যাগাজিন দেখলাম। একটা টেবিলে গুকনো রক্তের কালচে দাগ লেগে আছে। চেয়ারের পায়ী আর মেঝেতেও রয়েছে এই দাগ। বেশ কিছু জিনিস রয়েছে টেবিলে, যা ‘দেখে অনুমান করতে কষ্ট হয় না, রাতের খাওয়া শুরু করতে যাচ্ছিল হ্যানসন, ঠিক এই সময় আঘাত হেনেছে শর্ক।’

যে ঘরে খুন হয়েছে হ্যানসন, সেটাতে ঢুকতে হলে একটা বারান্দা পেরোতে হয়। বারান্দার পরে দরজা, পান্নায় লাগানো স্প্রিঞ্জ এমন মরচে পড়েছে, ঠেলা দিলেই কাঁচাকাঁচ করে ওঠে। তাহলে খুনির আগমন টের পেল না কেন বুড়ো? দরজা খোলা রেখে বসেছিল? কিন্তু তাতেও তার অলক্ষ্যে ঢোকা সম্ভব ছিল না

খুনীর। দরজা আগে থেকেই খোলা থাকলে পাল্লা খোলার শব্দ হয়তো হত না, কিন্তু লোকটাকে আসতে দেখতে পেতে সে। পথের অনেকখানি চোখে পড়ে খোলা-দরজা দিয়ে।

যের তিনটে জানালা। দুটো রয়েছে পেছনের দেয়ালে। জানালার বাইরে পনেরো ফুট নিচে পাথরের বেসিন। ওখান দিয়ে মানুষ আসার কোন উপায় নেই। তৃতীয় জানালাটার বাইরে আরও বেকায়দা অবস্থা, ওদিকে রয়েছে পাহাড়ের দেয়াল। এই জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে নিচে তাকানো।

চৌকাঠের চার ফুট নিচে একটা শৈলশিরা, বাড়ির পেছনে গিয়ে শেষ হয়েছে। শৈলশিরাকে আড়াআড়ি কেটেছে একটা সরু ফাটল, ইঞ্চি চারেক চওড়া আর দশ ইঞ্চি মত গভীর। পঞ্চাশ-ষাট ফুট একেবারে খাড়া নেমে গেছে পাহাড়ের দেয়ালটা, একটা পাথরের তাকমত রয়েছে ওখানে, তারপর থেকে আবার শুরু হয়েছে দেয়াল, শেষ হয়েছে প্রায় দু-শো ফুট নিচে। পাহাড়ে চড়তে ওঠানো, দুঃসাহসী কোন মানুষের পক্ষে নিচের দু-শো ফুট বেয়ে ওঠা হয়তো সম্ভব, কিন্তু পরের ষাট ফুট? একেবারেই অসম্ভব।

ফাটলের পাশে মাটিতে একটা অদ্ভুত দাগ। ছেঁচড়ে উঠে এসেছে যেন কোন দানব।

ভালমত ভাবার সময় পেলাম না, তার আগেই পেছন থেকে ডাক দিল শেরিফ, বাইরে লোক অপেক্ষা করছে।

তিনজন ওরা, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আকার দেখেই চিনলাম স্টার লেভিটকে, ছোটখাটো এক পাহাড় যেন। ফ্রানেলের ঢোলো শার্ট পরনে।

দ্বিতীয় লোকটা অ্যালেন কিনি।

তার পাশে দাঁড়ানো মেয়েটার দিকে তাকাতেই চক্ষু স্থির হয়ে গেল আমার। ঝঞ্জু শরীর, সোনালি চুল। হুইপকর্ডের প্যান্ট আর সবুজ উলেন শার্টে অপরূপ লাগছে তাকে। আগে কখনও দেখিনি, তবু ডিকসি হ্যানসনকে চিনতে কোন অসুবিধে হলো না আমার। বড় বড় বাদামী চোখ মেনে তাকাল সে, রক্তে ঝড় তুলে দেখা চাহনি।

‘এই যে!’ বলে উঠল লেভিট। বিচ্ছিরি কণ্ঠস্বর, ঝড়খড়ে। ‘এখানে কী? এসেই আগে আমার সঙ্গে দেখা করা উচিত ছিল। অনেক টাকা দিয়ে ভাড়া করেছে আমি তোমাকে।’

কথার ঢঙ দেখে গা জুলে গেল আমার। কোনমতে হজম করে গেলাম। ‘দেখা করার জন্যে তো ডাকোনি, খুনের তদন্ত করতে ডেকেছ, তা-ই তো করছি।’

আমার কথার ধরনও পছন্দ হলো না তার। তাছাড়া ‘তুমি’ করে বলেছি, সেটাও নিচয় খারাপ লেগেছে। হয়তো ঘুসি মারতে হাত তুলেই নামিয়ে গিলি আবার। ঝপ করে আমার হাত চেপে ধরে টান মারল। ‘এসো আমার সঙ্গে!’ শুঁড় দিয়ে পৈচিয়ে ধরে টানল যেন হাতি। কুৎসিত চেহারা হাতিটার, বসা নাক। ঘসি

মেরে ভেঙে দিয়েছে বোধহয় কেউ। ‘কথা আছে! এত মানুষের সামনে বলা যাবে না।’

টেনে আমাকে দূরে নিয়ে গেল লেভিট। মুখের সামনে মুখ নিয়ে এসে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, ‘শোনো, একটি হাজার ডলার দিয়েছি তোমাদের কোম্পানীকে। কাজেই তোমাকে আদেশ দেয়ার অধিকার আমার আছে। যা বলব, করবে। মেয়েটার ঘাড়ে দোষ চাপাও, তাকে খুনী প্রমাণ করো। বুঝেছ? আমাকে সন্দেহ করে বসো না আবার। শেষ খুঁটা করছি অনেক বছর আগে। আরেকটা করার জন্যে হাত নিশপিশ করছে।’

তার হুমকির পরোয়া করলাম না। ‘দেখো, টাকা দিয়েছ বলেই মাথা কিনে ফেলনি আমার। অন্যায় ভাবে কারও ঘাড়ে দোষ চাপাতে পারব না আমি। কোম্পানীকে ফী দিয়েছ, তারা আমাকে পাঠিয়েছে। যে কাজ করতে বলা হয়েছে, তাই করছি। সত্য জানার চেষ্টা করব আমি। কেন, ভয় পাচ্ছ নাকি? বোর্ফাস কিছু বেরিয়ে পড়বে?’

জুলে উঠল লেভিটের চোখ। ‘মনে হচ্ছে ভুল জায়গাতেই গিয়েছি আমি। তবে সিধে করে ফেলব। কি মনে হয় তোমার? আমি খুন করলে তোমাকে ডাকতে যেতাম? যা বলি শোনো, ওই মেয়েটাই খুন করেছে হ্যানসনকে, বুড়োর টাকার লোভে। দুঃখই হচ্ছে আমার। অনেকদিন ধরে ভাবছিলাম ব্যাটাকে খুন করব, পারলাম না। তার আগেই কাজটা সেরে ফেলল আরেকজন।’

‘তোমার সঙ্গে গঙগোলটা কি ছিল?’

অদ্ভুত চাহনি ফুটল লেভিটের কালো চোখে। ‘সেটা তোমার জানার দরকার নেই। আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করতেও বলা হয়নি তোমাকে! ওই মেয়েটার সর্বনাশ দেখতে চাই আমি। যাও, কাজে লাগে!’

‘শোনো, লেভিট,’ শান্তকণ্ঠে বললাম। ‘কাজে নামার আগে কিছু কথা জানতে হবে আমাকে। নইলে আমাকে দিয়ে সাহায্যের আশা ছাড়তে পারো। সত্যি কথা বলো, তুমি খুন করবে হ্যানসনকে?’

‘না,’ পকেট থেকে নোটের মোটা একটা তাড়া বের করল লেভিট। বুঝতে পেরেছে, দমকে কাজ হবে না। কয়েকটা একশো ডলারের নোট আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ‘রাখো। কাজে লাগবে। খরচ হয়ে গেলে আবার চেয়ে নিয়ো। শুধু মনে রেখো, আমার বিরুদ্ধে কোন খারাপ কথা যেন না রটে। আরেকটা ব্যাপার, আসামীর কাণ্ডগড়া দাঁড়াতে পারব না আমি।’

‘ভাল। গোটা দুই প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলাম। আরেকটা প্রশ্ন, সত্যিই কি সেদিন হ্যানসনের কেবিনে ঢোকানি? না চুকেই ফিরে এসেছ? কেন জিজ্ঞেস করছি বুঝতে পারছ নিচয়? আমি জানতে চাই, ওই সময় হ্যানসন জীবিত ছিল কিনা।’

হাসি ফুটল আবার লেভিটের চোখে। ‘এসব জানার জন্যেই ভাড়া করা হয়েছে তোমাকে, খোঁজখবর করে জেনে নাও। শুধু মনে রেখো, বুড়োটাকে আমি খুন

করিনি। আমি হলে লুকিয়ে করতাম না। সবার সামনেই গলা টিপে ধরতাম। সহজে আমি মাথা গরম করি না। অকারণে মানুষ খুন আমি ঘৃণা করি।’

লেভিটের কথা বিশ্বাস করলাম। ভয়ঙ্কর লোক সে। শিকাগোর অপরাধ জগতের একজন হোমড়া-চোমড়া ছিল এককালে। খুন করেছে কয়েকটা, তবে পুলিশ তার টিকিও ছুঁতে পারেনি। চমৎকার অ্যালিবাই তৈরি করে রেখেছিল, একটা কেসেও কোর্ট তাকে অপরাধী ঘোষণা করে শাস্তি দিতে পারেনি।

কিন্তু তাকে হ্যানসনের খুনি ভাবতে পারলাম না। একটা ব্যাপারে অবাধ লাগছে, ডিকসিকে খুনি প্রমাণের জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে কেন সে?

কিনির সঙ্গে কথা বলছে পণ্ড। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ডিকসি। আমি কাছাকাছি হতেই চোখ তুলল।

বলতে গেলাম, ‘আমার নাম...’

‘ওটা না বললেও চলবে!’ ঝাঁঝিয়ে উঠল ডিকসি। ‘আপনি কে, কেন এসেছেন, ভাল করেই জানি। আমাকে খুনি প্রমাণ করতে চান তো? পারলে করুন। কোন প্রশ্ন আছে? থাকলে জলদি সেরে ফেলুন।’

‘আছে। কি সেন্ট ব্যবহার করেন? শ্যানেল কোম্পানীর গার্ডেনিয়া?’

এমন টক-দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল ডিকসি, সেটা দুধের ওপর ফেললে সঙ্গে সঙ্গে দই হয়ে যেত। ‘বাজে কথা রাখুন।’

‘বেশ। অন্য প্রশ্ন করছি। কতদিন পরে চাচার সঙ্গে দেখা করতে এলেন? এর আগে কবে এসেছিলেন রানাগাটে?’

‘রানাগাটে এই প্রথম। চাচাকেও আগে কখনও দেখিনি।’

‘আপনার দূর সম্পর্কের এক ভাই আছে শুনেছি?’

‘অতটা দূর সম্পর্ক নয়। ফুফাত ভাই। নাম ভিন কার্টার। একটা সার্কার্স পার্টিতে কাজ করে, জন্তু-জানোয়ারের খেলা দেখায়। বয়েস উনচল্লিশ, খুব ভাল স্বাস্থ্য। আপনার মত টিকটিকিকে ধরে বেদম ধোলাই দেয়ার ক্ষমতা রাখে।’

হাসলাম। ‘যাক, স্পষ্ট করে কথা বলতে পারেন। আপনার মত সবাই বললে কাজ অনেক সহজ হয়ে যেত আমার। তো, চাচাকে কি আপনিই খুন করেছেন?’

শীতল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল ডিকসি। ‘না। ওর সঙ্গে পরিচয় মাত্র কয়েক দিনের। ঘৃণা করারও সময় পাইনি, ভালবাসারও না। ভিন ছাড়া ওই চাচাই আমার একমাত্র নিকট-আত্মীয়। তাই তাকে দেখতে এসেছিলাম।’

‘আপনি জানেন, মিস্টার হ্যানসনের সম্পত্তির মালিক হবেন আপনি?’

‘জানি। বছর তিনেক আগে চিঠি লিখে জানিয়েছিল চাচা। গত শনিবারে আবার বলেছিল কথাটা।’

‘কি কাজ করেন? চাকরি-বাকরি, নাকি অন্য কিছু?’

‘চাকরি। পার্সোনাল সেক্রেটারি।’

‘চমৎকার। বঁচে গেছে নিশ্চয় আপনার বস। আপনাকে ডিঙিয়ে কেউ যে তার

ঘরের ত্রি-সীমানায় ঘেঁষতে পারে না, বুঝতেই পারছি।...এখানে উঠেছেন কোথায়?’

‘হোটেলে।’

‘চাচার সঙ্গে ক’বার দেখা করেছিলেন?’

‘তিনবার। যেদিন এখানে এসেছি সেদিন একবার, দু-ঘণ্টা থেকেছি কেবিনে।

বিতীয়বার পরদিন দিনের বেলা। তৃতীয়বার, যে রাতে খুন হয়েছে চাচা, সে রাতে।’

‘কি মনে হয়েছে চাচাকে দেখে?’

দ্রুত আমার মুখে চোখ বুলিয়ে নিল ডিকসি। কিছু বোঝার চেষ্টা করল।

‘নিঃসঙ্গ, ক্লান্ত একজন ভাল মানুষ।’

আরও প্রশ্ন করলাম। আমার সব কথারই জবাব দিল ডিকসি, নির্বিধায়।

জানলাম, ডিকসির ভাই ভিন কার্টার সুদর্শন তরুণ। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরেছে দীর্ঘদিন, জন্তু-জানোয়ার ধরেছে। তারপর কয়েক বছর আগে ওই ব্যবসা ছেড়ে একটা সার্কার্স পার্টিতে চুকেছে। কর্মচারী নয়, ব্যবসার অংশীদার। যাবার জীবন।

পার্টি যখন যেকোনো যায়, খেলা দেখানোর জন্যে কার্টারও যায় দেখানো।

মাত্র কয়েক দিনেই চাচার সঙ্গে মিস্তি একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ডিকসির।

এই অল্প সময়েই রান্না করে খাইয়েছে চাচাকে, কাজে সাহায্য-সহায়তা করেছে।

শেষবার কেবিন থেকে বেরোনোর সময় হ্যানসনকে জীবিত দেখেছে সে, কসম খেয়ে বলল।

লেভিটের সঙ্গে পূর্ব পরিচয় ছিল না, কিন্তু কোন কারণে তার ওপর খেপে আছে লোকটা। কি কারণ, তার চাচার সঙ্গে কি নিয়ে গোলমাল, জানে না ডিকসি। লোকটার ওপর তার চাচা হাড়ে হাড়ে চটা ছিল কোন কারণে।

শুধু তাই না, সব সময় কাছাকাছি একটা পিস্তলও রাখত হ্যানসন।

জিজ্ঞেস করলাম, ‘কাছাকাছি বলতে কি বোঝাচ্ছেন? সঙ্গে?’

‘না, তাকের ওপর, কতভালো কাপ-প্লেটের ভেতর লুকানো। নতুন করে তেল দেয়া। কাপ নামাতে গিয়ে দেখে ফেলেছিলাম।’

তারমানে বিপদ আশা করছিল হ্যানসন। কার কাছ থেকে? স্টার লেভিট? নাকি অন্য কেউ?

সেই দিনই রাতে। কাফেতে এসে চুকলাম। বসলাম একটা খালি টেবিল দেখে।

কাউন্টারে বসে কিছু পড়ছিল ওয়েন্ট্রেস, আমাকে দেখে উঠে এল। সোনালি চুল, মুখ গোমড়া, তবে ফিগারটা চমৎকার। অর্ডার নিয়ে চলে গেল রান্নাঘরে।

একটা ম্যাগাজিন পড়ছিল মেয়েটা, কাউন্টারের ওপর ফেলে রেখে গেছে উপড় করে। নামটা দেখে কৌতূহল হলো আমার। *বিলবোর্ড*। মূলত সিনেমা ম্যাগাজিন। থিয়েটার, সার্কার্স, মেলা এসব নিয়েও লেখা থাকে ওতে। অনেকের পড়ে এটা, ওয়েন্ট্রেসও পড়ছে। এতে অবাধ হওয়ার কিছু ছিল না, কিন্তু আমার মনে

পড়ে গেল হ্যানসনের ভায়ের কথা। ভিন কার্টার, সার্কাসে খেলা দেখায়।
খাবার দিয়ে গেল ওয়েস্ট্রেস।

এই সময় ঘরে টুকল লেভিট। উলেন শার্ট আর টুইডের প্যান্ট পরনে। আমার টেবিলের উল্টো দিকের চেয়ারে বসে পড়ল। মৃদু ক্যাঁচকোঁচ করে প্রতিবাদ জানাল চেয়ার। ওজনটা যে সহিতে কষ্ট হচ্ছে বুঝিয়ে দিল। বিশাল একটা খাবা টেবিলে রেখে সামনে রুকল সে। 'কিছু পেলে? মেয়েটাকে ফাঁসানোর মত?'

একটুকরো কাবাব কেটে মুখে ফেললাম। চিবাতে চিবাতে জবাব দিলাম, 'কয়েকটা ব্যাপার জেনেছি। সেগুলো নিয়েই ভাবনা-চিন্তা করছি এখন।'

মেজাজ ভাল লেভিটের। লক্ষ করলাম, কথা বলতে বলতে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে সে, কাউকে খুঁজছে। 'আমাকে ফাঁসানোর মত কিছু পাবে না। বুড়োটার সঙ্গে ঝগড়া ছিল আমার, কিন্তু আমি তাকে খুন করিনি। কেবিনেই তুকিনি সেরাতে। কেউ বলতে পারবে না, আমি ঢুকেছি।' 'কিনি বুড়োটাও না। সে কেবিনের দিকে যেতে দেখেছে আমাকে, ফিরে আসতেও দেখেছে।' 'তাকে জিজ্ঞেস করলে বলে দেবে, যেতে-আসতে কতখানি সময় লেগেছে। ওটুকু সময়ে কেবিনে গিয়ে একজনকে খুন করে ফিরে আসা যায় না। তবুও লোকের সন্দেহ যাচ্ছে না আমার ওপর থেকে। তোমার কাজ আমাকে সন্দেহমুক্ত করা।'

'সেটা হয়তো করা যাবে।'

চেয়ারে হেলান দিল লেভিট। এই প্রথম নরম চোখে তাকাল আমার দিকে। ওর আচরণে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গেল, খুন্টা সে নিজের হাতে করেনি, কিন্তু জানে কে করেছে। অপরাধটার সঙ্গে গলা পর্যন্ত ডুবে আছে সে।

ওয়েস্ট্রেস এল। 'আপনার জন্যে কিছু...মিস্টার লেভিট?'

মেয়েটার ভাব-ভঙ্গি ভাল মনে হলো না আমার। ইঙ্গিতে কিছু বোঝাতে চাইছে না তো? তার হাতের ন্যাপকিন মাটিতে পড়ে গেল, উবু হয়ে সেটা তুলে দিল লেভিট।

ওরা ভেবেছে কি আমাকে? গাধা? আড়াচোখে দেখতে পেলাম ছোট একটা কাপজের টুকরো ন্যাপকিনে ডরে ফেলল লেভিট, গুঁজে দিল মেয়েটার হাতে।

শুধু এক কাপ কফি খেলো লেভিট, আরও দু-চারটা কথা বলে উঠে চলে গেল।

বিল দেয়ার জন্যে কাউন্টারে এলাম। তেমনিভাবে পড়ে আছে ম্যাগাজিনটা। খুচরা আছে, তবু ইচ্ছে করলেই লেভিটের দেয়া একটা একশো ডলারের নোট বাড়িয়ে দিলাম মেয়েটার দিকে। ভাঙতি এখানেই আছে, নাকি রান্নাঘরে যেতে হবে তাকে?

আমার আশা পূর্ণ হলো। রান্নাঘরেই ভাঙতি আনতে যেতে হলো মেয়েটাকে। ম্যাগাজিনটা উল্টে চট করে দেখে নিলাম কি পড়ছিল সে। যা ভেবেছিলাম, তাই। নেভাডায় সার্কাস পার্টি এসেছে, সেই খবর।
আবার আগের মত করে রেখে দিলাম পত্রিকা।

ভাঙতি নিয়ে ফিরে এল মেয়েটা। বেরিয়ে এলাম কাফে থেকে।

শান্ত রাত। পরিষ্কার আকাশে তারার মেলা। খনির দিক থেকে আসছে কমপ্রেশর মেশিনের একটানা একঘেয়ে আওয়াজ। কাজ চলছে খনিতে, চকিশ ঘন্টাই চলে।

রান্নাঘাটে আসার পর এই প্রথম একটা ভাল সূত্র পেয়েছি। নেভাডায় সার্কাস পার্টি, রান্নাঘাট থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে। কোথাও বুঝি একটা যোগাযোগ আছে, ঠিক ধরতে পারলাম না।

হোটেলের টেলিফোন আছে। লস অ্যাঞ্জেলেসের লাইন পাওয়া গেল। ঝাড়া বিশ মিনিট কথা বললাম বসের সঙ্গে। ভিন কার্টারের ব্যাপারে ভালমত খোঁজখবর নিয়ে আমাকে জানাতে অনুরোধ করলাম তাঁকে।

ডিকসি হ্যানসনের ব্যাপারেও খোঁজখবর নেব আমি, তবে সেটা পরে। অ্যালেন কিনি সম্পর্কেও খোঁজ নেয়া দরকার। কয়েকটা প্রশ্নের জবাব জানতে হবে আমাকে। খুন্টা যখন হয়, তখন ভিন কার্টার কোথায় ছিল? রুট হ্যানসন আর লেভিটের মধ্যে ঝগড়াটা কিসের? গোমড়াগুলো ওয়েস্ট্রেস আর লেভিটের সম্পর্ক কি? কার্টারের সঙ্গেও সম্পর্ক আছে মেয়েটার? লেভিটের ব্যাপারে কি কিছু গোপন করছে অ্যালেন কিনি?'

হোটেলের লবিতে একটা চেয়ারে এসে বসলাম। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে এক ঘন্টা পরেই খবর এসে গেল। বস জানালেন, নেভাডায় যে সার্কাস পার্টি এসেছে, ওতেই খেলা দেখায় ভিন কার্টার। হ্যানসন খুন হওয়ার আগের দিন পার্টিটা ছিল লা ভেগাসে, পরদিন গেছে ওগডনে।

লবিতে ডেক্স আছে, তার পাশে একটা স্ন্যাক, তাতে কিছু টাইমটাবল আর ম্যাপ পেলাম। একটা ম্যাপ তুলে নিয়ে টেবিলে বিহালাম।

দেখতে দেখতে উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। একটাই রাস্তা। ও-পথেই গেছে সার্কাস পার্টি। রাস্তাটা হ্যানসনের মেসা থেকে মাত্র এক মাইল দূরে।

তিনজন ছিল সন্দেহের তালিকা, এবার হলো চারজন। সবার ওপরই সন্দেহ জোরাল হচ্ছে। লেভিট আর হ্যানসনের কি নিয়ে ঝগড়া ছিল, এটা জানতে পারলেই কাজ অনেক সহজ হয়ে যেত। অস্থির ভাবে পায়চারি করছি, আর ভাবছি। একনাগাড়ে খুঁচিয়ে চলেছি সপ্তকে, যদি কোন জবাব দিতে পারে। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। সোনা! সোনার খনি! চোরা পথে বেরিয়ে যায় সোনা মেশানো আকরিক।

ডিকসিকে বেরোতে দেখলাম তার ঘর থেকে। এগিয়ে আসছে।

চাচার কেবিনে না উঠে হোটেলের উঠেছে সে। কেন?

আমার চোখে চোখ পড়ল তার। পাশ কেটে চলে যাওয়ার আগে ডাকলাম,

‘একটু দাঁড়াবেন?’

দাঁড়াল ডিকসি।

‘শহরটা বড় বেশি একঘেয়ে,’ বললাম। ‘কথা বলার মানুষ নেই। চলুন না, কোথাও বসি? চা-কফি খাই?’

কড়া একটা জবাব আশা করেছিলাম, কিন্তু আমাকে অবাধ করে দিয়ে হাসল সে। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল। ‘কোথায় বসবেন?’

‘এখানেই।’

কফি এল। কাপে চুমুক দিল ডিকসি। মৃদু হাসল। ‘তারপর? শরিকের হাতে আমাকে তুলে দেয়ার আর কত দেরি?’

‘দেখুন, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনার চাচার খুন্সী ধরা পড়ুক, চান তো? তাহলে উন্টোপাল্টা কথা বাদ দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন?’

‘আমাকে দোষী প্রমাণ করার জন্যে আসেননি আপনি?’

‘না। আমি এসেছি লেভিটকে নির্দোষ প্রমাণ করতে। ওই লোকটা দুখে-ধোয়া সাধুরূপ নয়, জানি আমি; মানুষ খুনও করেছে, কিন্তু হ্যানসনকে সে খুন করেনি, এটা জোর দিয়ে বলতে পারি।’

‘কি করে পেলেন এই জোর?’

‘তার খুন করার রীতি আমার জানা। সে করলে এমনভাবে অ্যালিবাই তৈরি করে রাখত, যাতে তার ওপর সন্দেহই না জাগে। যা বুঝলাম, সে চায় ধামাচাপা না পড়ে বরং ব্যাপারটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি হোক। খুনটা সে করে থাকলে এরকম করত না। তবে কিছু একটা সে করেছে। কী করেছে সেটা জানতে পারলে সুবিধে হত।’

‘অ্যালেন কনিকে সন্দেহ হয় আপনার?’

মাথা নাড়লাম। ‘না। মিস্টার হ্যানসনের সঙ্গে তার ঝগড়াঝাটি ছিল বটে, কিন্তু খুন করার পর্যায়ে পৌঁছায়নি। বয়েস হলে মেজাজ ক্যাটকাটে হয়ই, অথথাই রোগে ওঠে মানুষ। দু-জনের মতাব একরকম হলে তো কথাই নেই, এমন লাগ লাগে, একে অন্যের মুখ দেখতে চায় না। পরে আবার ঠিকও হয়ে যায়। বেশি ঘনিষ্ঠ হলেই এমন করে।’

‘তাহলে দাঁড়ালটা কি? লেভিট বাদ, কিনি বাদ, বাকি রইলাম আমি।’

‘আপনাকেও তো খুন্সী ভাবতে পারছি না।’

ডিকসি হাসল। ‘তাহলে কে? আপনাপনি তো আর খুনটা হয়ে যায়নি।’

‘তা কি আর হয়।’

একটু দ্বিধা করে শেষে বলে ফেলল ডিকসি, ‘কাক্ষেতে একটা আশুন দেখেছি। মনে হচ্ছে, কিছু পোড়ানোর তালে আছে।’

‘আমারও তাই ধারণা।’

‘ও, আপনিও ধরে ফেলেছেন।’

‘ধরার ব্যাপার হলে তো ধরবই।’

‘মানুষগুলো যেন কেমন এখানকার। মন খুব ছোট। বাইরের কেউ এলেই সন্দেহের চোখে দেখে।’

‘অনেক ছোট শহর তো, সে-জন্যেই বোধহয় এরকম।’

‘তা হতে পারে। মিস্টার কানাভান, আপনি সাবধান থাকবেন। লেভিট আপনাকে দাওয়াত দিয়ে এনেছে বলেই ভাববেন না বেঁচে গেছেন, বরং শত্রু আরও বাড়ল আপনার। ও এখানে অনেকেরই চক্ষুশূল।’

‘সেটা আমিও বুঝতে পেরেছি। যাই হোক, সাবধান করার জন্যে ধন্যবাদ।’

‘খানিকক্ষণ চূপাচাপ রইলাম দু-জনেই। কেউই আর কথা খুঁজে পাচ্ছি না। এভাবে বসে থাকতেও ভাল লাগছে না। বললাম, ‘এখানে বসে গরম। চলুন না, বাইরে থেকে খানিক হেঁটে আসি।’

এবারও আমাকে অবাধ করে দিয়ে রাজি হয়ে গেল ডিকসি।

বাইরে ফুরফুরে হাওয়া। দিনের প্রাচণ্ড উত্তাপ গুঁষে নিয়েছে শীতল বাতাস। হোটেলের সামনে দিয়ে চলে গেছে পথ, সামান্য একই মোড় নিয়ে উঠে গেছে পাহাড়ে। নীরবে ওই পথ ধরে পাশাপাশি হেঁটে চললাম দু-জনে। কোথায় যাব জানি না।

পাহাড়ে উঠে এলাম। নিচে রানাগাট শহর। একপাশে আরেকটা বড় পাহাড়, গোধার আছে আলোর সারি। ওখানেই খনি।

চাঁদ মাথার ওপরে। কয়েকটা পাহাড়ের মাঝে ছোট্ট শহরটা, মনে হচ্ছে যেন হাতে তালুতে তুলে নিয়েছে কোন বিশাল দানব। বাঁ পাশে আমাদের কাছাকাছিই রয়েছে স্টার লেভিটের ক্যালিফোর্নিয়া-স্টাইল বিরাট ব্যাঙ্ক হাউস। গটার পরে উপত্যকা, তারপরই আধমাইল জুড়ে রয়েছে অনেকগুলো পাকা বাড়ি—হ্যানসন গোল্ড মাইন, খনি এবং কারখানা।

ডানে, শহর থেকে দূরে বিশাল মেসো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে, কালো দেখাচ্ছে চাঁদের আলোয়।

চূপাচাপ দাঁড়িয়ে আছি আমরা। প্রকৃতির অপরূপ শোভা যেন বোবা করে দিয়েছে আমাদের। স্তব্ধ নীরবতা থাকলে এ-সময় বেশি মান্যত, আরও ভাল লাগত, কিন্তু পরিবেশ নষ্ট করে দিচ্ছে কমপ্রেশরের বিরক্তিকর আওয়াজ।

হঠাৎ চোখে পড়ল কালো মূর্তিটা। একটা বাড়ির ছায়া থেকে বেরিয়ে শহরের একমাত্র পথে উঠছে। আমি দেখেছি, না ডিকসি আগে দেখেছে, জানি না; তার আঙুল চেপে বসল আমার কব্জিতে।

শহরের পথে মানুষ চলাচল করতেই পারে, তাতে আমাদের কি? এভাবে চমকে উঠলাম কেন। জবাব পেলাম না। তবে অনেক অদ্ভুত ব্যাপারই ঘটে পৃথিবীতে, যার কোন ব্যাখ্যা নেই। এটাও হয়তো তেমননি কোন ব্যাপার।

ঘড়ির দিকে তাকালাম। লুমিনাস ডায়াল, দেখতে অসুবিধে হলো না, দশটা

বেজে দশ। সময়ই যেন বলে দিল, শহরের পথে ও কে। কোথায় যাচ্ছে, তা-ও বুঝতে পারছি। অন্ধকার ছায়ায় আবার হারিয়ে গেল মূর্তিটা।

ডিকসির দিকে ফিরে বললাম, 'হোটেলের যান। আপনাকে সঙ্গে করে পৌঁছে দিতে পারলে ভাল হত, কিন্তু ভদ্রতা দেখানোর সময় এখন নেই।'

চাঁদের আলোয় ডিকসির চোখ আর এখন বাদামী লাগছে না, কালো। 'আপনি ওর পিছু নেনবেন?'

'আমি গোয়েন্দা, সেটাই তো আমার কাজ। কাফের আশুন কোথায় চলেছে দেখতে চাই। যান। সকালে হোটেলের দেখা হবে।'

'আমি আপনার সঙ্গে যাব।'

আপত্তি করতে পারি, কিন্তু ডিকসিকে হোটেলের ফিরে যেতে রাজি করাতে পারব কিনা সন্দেহ আছে। কথা কাটাকাটি করতে গিয়ে হয়তো অহতুক সময়ই নষ্ট হবে। এখন তাড়াহুড়া। তাই কথা না বাড়িয়ে নিয়ে নিলাম সঙ্গে।

পাহাড় বেয়ে উপত্যকায় নামতে হবে, আমি একা হলে তাড়াতাড়িই পারতাম। কিন্তু সঙ্গে ডিকসি, ফলে দেরি হতেই থাকল। অনেক কষ্টে হাঁটু আর কনুইয়ের ছাল-চামড়া তুলে অবশেষে নিচে আমার পাশে এসে দাঁড়াল সে। আমার চামড়াও অক্ষত নেই। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে ক্যাকটাস আর অন্যান্য কাঁটালতায় লেগে ছড়ে গেছে জায়গায় জায়গায়।

যা-ই হোক, ঠিক সময়েই পৌঁছেছি আমরা। আধ মিনিট পর পদশব্দ কানে এল।

থেকে গেল একটু পর। ঘণ্টার শব্দ হলো। মৃদু ক্যাচক্যাচ করে খুলে গেল গেটের পাল্লা।

রায়ুফ হাউসের সামনের গেটে দারোয়ান থাকতে পারে, তাই সেদিকে গেলাম না। তাহলে এলাম পেছনে। আরেকটা গেট আছে। ঠেলা দিতে হাত বাড়িয়েই থেকে গেলাম। চাঁদের আলোতেও দেখা গেল তারটা। উফ্, বড় বাঁচা বেঁচেছি। হাত দিয়ে ফেললে আর রক্ষা ছিল না। ইলেকট্রিক তার। নিচয় হাই ভোল্টেজ বিদ্যুৎ বইছে লোহার গেটে। নইলে এখানে এভাবে তার লাগানোর আর কোন কারণ নেই।

সমস্যায় পড়ে গেলাম। ঢুকব কোন পথে? গ্যারেজ দিয়ে? আছে ঢোকার জায়গা?

অভিজ্ঞতা থেকে জানি, বাইরের উৎপাত থেকে বাঁচার জন্যে যত কড়াকড়িই করা হোক, এমন কিছু ফাঁক থেকেই যায়, চেষ্টা করলে যেখান দিয়ে ঢুকবে পড়া অসম্ভব হয় না। এখানেও রয়েছে তেমন দুর্বল জায়গা, গ্যারেজের একটা জানালার পাকট থেকে ছোট দু-একটা যন্ত্রপাতি বের করে সহজেই খুলে ফেললাম জানালার পাল্লা। ঢুক পড়লাম ভেতরে। ডিকসিকেও ঢুকতে সাহায্য করলাম।

অন্ধকারে চূপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম কয়েক সেকেন্ডে। কোথাও কোন নড়াচড়া নেই। দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম বাইরে। নির্জন। কোন সাড়াশব্দ নেই। ছায়ায়

ছায়ায় চলে এলাম বসার ঘরের জানালার কাছে।

এখন ধরা পড়লে আমাদের কি অবস্থা হবে, বুঝতে পারছি। শেরিফের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাববে না লেভিট। যা করার নিজেই করে ফেলবে। বিরাট এক আশ্চর্য্যের বসে থাকতে দেখলাম তাকে। পায়ের তলায় পুরু নাভাজো কার্পেট। এতবড় চেয়ারেও ঠিকমত জায়গা হচ্ছে না হাতিটার, কাঁধের দু-পাশ বেরিয়ে আছে চেয়ারের হেলানোর দু-দিকে। জলন্ত দৃষ্টি ওয়েন্ট্রিসের ওপর স্থির।

জানালার পাল্লা ভেজানো। সামান্য ফাঁক করতে পারলে ভেতরের কথাবার্তা শোনা যেত। ঘষামাজা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ি, পাল্লা খুলতে গেলে কি আওয়াজ হবে? নেব কুকি?

কৌতূহলেরই জয় হলো। ভাগ্যও আমার ভাল। নিঃশব্দেই খুলে গেল পাল্লা। ফাঁক দিয়ে ভেসে এল লেভিটের কর্কশ গলা, 'কতবার না বলেছি, যখন তখন এখানে আসবে না? রিনি, একটা কথা কেন বুঝতে পারছ না, কাউবয় শেরিফটা বোকা নয়।'

'কিন্তু আমাকে আসতে হলো, বাধ্য হয়েই। ওই টিকটিকিটা ম্যাগাজিনটা দেখে ফেলেছে। কি পড়ছিলাম, জেনে গেছে।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল লেভিট। অতবড় দেহটা যেভাবে সচ্ছন্দে নাড়ল সে, অবাকই হয়ে গেলাম। ধমকে উঠল, 'যেখানে সেখানে ওভাবে রাখো কেন! মনে রেখো, দশ লাখ ডলার...এভাবে চললে ওই টাকার আশায় থুক পড়বে, বলে দিলাম!'

'কিন্তু তোমার ঘাড়ে তো আর চাপাতে পারবে না,' লেভিটকে নয়, যেন নিজেকেই প্রবোধ দিচ্ছে রিনি।

'কে বলল, পারবে না? যদি পারে? সেন-জেনোই খুব সাবধান থাকতে হবে আমাদের। তোমাকে দলে নেয়াটাই ভুল হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে এখন। কখন যে কি গণগোল করে দেবে কে জানে। সব ভেস্তে যাবে তখন।' বকাবকি করে রাগ খানিকটা কমল লেভিটের। কণ্ঠস্বর সামান্য কোমল করে বলল, 'যাক, যা হওয়ার হয়ে গেছে, এরকম অসাবধান আর হলো না। গোয়েন্দাটাকে অত ভয়ের কিছু নেই। ওটা একটা আন্ত গাধা। খালি ভেজ আছে, মাথায় একরঙি খিলু নেই।'

রিনি বলল, 'দেখো স্টার, মানুষকে ছোট করে দেখা তোমার স্বভাব। এ-জন্যে পড়াবে একদিন। গোয়েন্দাটাকে যত বোকা তুমি ভাবছ, ততটা বোকা সে নয়।'

আবার রেগে উঠল লেভিট, 'জানোই যদি, বোকামিটা করলে কেন?'

'ইচ্ছে করে কি আর করছি? ভুল হয়ে গেছে।'

'হয় কেন?'

'ভুল সবারই হয়। তোমারও হয়। শোনো, লীডার বলেছে...'

'আরে রাখো তোমার লীডার।' হাত নেড়ে বাতাসকেই যেন থালুড় মারল লেভিট। 'ও কি জানে? ওর কোন ক্ষমতা আছে? যা করেছে, ওই পর্যন্তই দৌড়।'

করতে তো হচ্ছে সব আমাকেই।’

‘যা-ই বলে, স্টার, গোল্ডেনস্টার্টাকে ভাড়া করা ঠিক হয়নি। ওর চাহনি দেখেছ?’

‘দেখব না কেন? গাধার চাহনি।’

কানের কাছে মৃদু হাসির শব্দ, ফিক করে হেসে ফেলেছে ডিকসি, তাড়াতাড়ি তার মুখ চেপে ধরলাম।

‘যা বলি শোনো,’ পিস্তলের নিশানা করার মত করে রিনির দিকে আঙুল তুলল লেভিট, ‘আমি না ডাকলে আর আসবে না। কান খাড়া রাখবে সব সময়। কাফেতে কে কি বলে শোনার চেষ্টা করবে। শেরিফের ওপর চোখ রাখবে, গোল্ডেনস্টার্টাকে যখন তোমার এত ভয়, তার ওপরও রাখবে। অ্যালেন কিনির ব্যাপারে কোন কথা কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে জানাবে আমাকে।’

‘মনে হচ্ছে ওকে তুমি ভয় পাও? ওই বুড়োটাকে ভয়ের কি আছে?’

‘ভয় করলে এ-শহরের ওই একটা লোককেই করতে হয়। ঈগলের চোখ ওর, কয়োটোর কান। পিস্তলের নিশানাও খুব ভাল। ওর সঙ্গে লাগতে যাওয়ার আগে দশবার চিন্তা করা উচিত।’

হাত নেড়ে রিনিকে চলে যেতে বলল লেভিট।

ঘুরে দাঁড়াল রিনি। দরজার দিকে এগোল। পেছনে গেল লেভিট। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল দু-জনই। এর পর কি ঘটবে, আঁচ করতে পারলাম। ওসব আর দেখার ইচ্ছে নেই। যা শোনার শুনেছি, নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়া দরকার এখন।

বেরিয়ে এলামও, কিন্তু জানলাম না, মারাত্মক একটা গণগোল করে ফেলেছে ডিকসি।

সকালে কফি খেতে খেতে অনেকক্ষণ চিন্তা করলাম। এখানে আসার পর থেকে যা যা ঘটেছে, খতিয়ে দেখলাম মনে মনে। কিছুতেই হ্যানসনের খুনীর আসনে বসাতে পারলাম না লেভিটকে।

সমস্ত ঘটনা একটা দিকেই আঙুল নির্দেশ করছে। বিলবোর্ড ম্যাপাজিনের লেখাটা নিয়ে আবার ভাবলাম। নাহ্, ভিন কার্টারের সঙ্গে দেখা না করলেই নয় আর।

কাফেতে এসে ঢুকল লেভিট। টেবিলের উল্টো দিকের চেয়ারে বসল। কোন ভূমিকা না করে বললাম, ‘তুমি খুনী নও। কে হ্যানসনকে খুন করেছে এখন আমি জানি। শুধু বুঝতে পারছি না, ঢুকল কোনখান দিয়ে।’

নীরের পকেট থেকে নোটের তাড়া বের করল লেভিট। শুনে শুনে পাঁচটা একশো ডলারের নোট খুলে নিয়ে বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। ‘নাও। নিয়ে বাড়ি চলে যাও। তোমার আর কোন কাজ নেই এখানে।’

‘মানে?’

ঝাটল সাপের চাহনি ফুটল লেভিটের কালো চোখে। ‘বুঝলে না? ভাগতে বললাম শহর থেকে। কাজ করতে আনলাম আমার, করছ ওই মেয়েমানুষটার। আমি ভালমানুষ, তাই তার পরেও তোমার পাওনা বুঝিয়ে দিচ্ছি। যাও, চলে যাও।’

‘যদি থাকতে চাই? আমার নিজের খরচে?’

‘তোমার কোম্পানী তাকে রাজি হবে না।’

‘সেটা আমি বুঝব।’

কঠিন হাসি ফুটল লেভিটের ঠোঁটে। ‘আজ রাত বারোটটা পর্যন্ত সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে শহর ছাড়বে, আর কোন কথা শুনেতে চাই না।’

শব্দ করে পেছনে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল সে।

খানিক দূরে আরেকটা টেবিলে বিশালদেহী এক লোক বসে আছে, খনির শ্রমিক-টমিক হবে। তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল লেভিট। ঢালাও হুকুম দিল, ‘বারুড, রাত বারোটটা এক মিনিটের মধ্যে যদি শহর না ছাড়ে ও, কান দুটো ছিঁড়ে নিও। আর কিছু করার দরকার নেই। একা পারবে না বুঝলে সঙ্গে লোক রেখো।’

আমার দিকে ফিরল লোকটা। চোয়াল বসা, কান দুটো মাথার সঙ্গে লেপটে আছে। ছোট ছোট চোখ। ঠাণ্ডা গলায় বলল, ‘আর কাউকে লাগবে না।’

বাইরে বেরিয়ে এলাম। উজ্জল রোদ। চূপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম মিনিটখানেক। লেভিটের এই হঠাৎ পরিবর্তন বিস্মিত করেছে আমাকে। রাতেও আমাকে নিয়ে বিন্দুমাত্র ভয় ছিল না তার। মাত্র কয়েক ঘণ্টায়ই এতটা বদলে গেল!

রওনা হলাম শেরিফের অফিসে।

প্রথম দিন যেমন দেখছি, ঠিক তেমনভাবে ডেস্কের ওপর পা তুলে দিয়ে বসে আছে ওয়াল্ট পণ্ড। আমাকে দেখে হাসল। ‘নতুন কোন খবর?’

‘হ্যাঁ, বললাম।’ গণগোল।’

‘সত্যি বলতে কি কেসটার মাথামুণ্ড কিছু বুঝতে পারছি না আমি। ওই কিনি বুড়োটা মুখ খুলছে না। লেভিটও অনেক কিছু জানে, সে-ও বলতে চাইছে না।’

লেভিট যে আমাকে শহর থেকে চলে যেতে বলেছে, জানালাম শেরিফকে। বললাম, ‘কিন্তু আমি যেতে চাই না। আমার ধারণা, আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে একটা সুরাহা করে ফেলতে পারব। ব্যাপারটা নির্ভর করছে এখন আপনার ওপর।’

‘আমার ওপর?’

‘হ্যাঁ। আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্যে রানাগাটের ডেপুটি শেরিফ নিযুক্ত করতে হবে আমাকে।’

‘ডেপুটি শেরিফ?’

‘হ্যাঁ। ক্ষমতা দরকার আমার।’

আমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ শেরিফ। তারপর পা নামাল ডেস্ক থেকে। ডয়্যার খুলে ব্যাজ বের করল। ‘দেখি, ডান হাতটা দাও তো।’

দরজার কাছে এসে ঘুরে দাঁড়ালাম। 'ও হ্যা, শোরফ, কয়েক ঘণ্টার জন্যে শহরের বাইরে যাব আমি। ওগডেনে সার্কাস দেখতে।'

'গ্যারেজে একটা গাড়ি আছে,' কেন, কি কারণে যাচ্ছি, কিছুই জানতে চাইল না শেরিফ। শুধু জিজ্ঞেস করল, 'কখন?'

'রাত বারোটা দশ মিনিট।'

ফিরে এসে চেয়ারে বসলাম আবার। খুলে বললাম আমার প্ল্যান।

শুনে মাথা ঝাঁকাল শেরিফ। 'রোপ বারডটা একটা হারামজাদা। সাবধানে থাকবে!'

ইহঁ হোক আপনার নিজা সঙ্গী

রাত সাড়ে এগারোটা সার্কাসে গিয়ে শেরিফের গাড়ি বের করলাম। এনে রাখলাম কাফের সামনে। শনিবার রাত, আজ বারোটা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

আমাকে দেখেই উজ্জ্বল হলো ডিকসির চোখ। ওর টেবিলে গিয়ে বসলাম। অর্ডার নিতে কাছে এল রিনি। ওয়েস্টেসকে গুনিয়ে গুনিয়ে বললাম, 'ডিকসি, লেভিট আমাকে বিদায় দিয়েছে।'

'কেন?' ভুরু কঁচকাল ডিকসি।

'তার কাজ নাকি কিছুই করিনি, খালি আপনার সঙ্গে প্রেম করে কাটিয়েছি।' ঘরের এক কোণে বসা রোপ বারডুকে দেখালাম—আমার দিকেই চেয়ে আছে, 'ওই জন্তুটাকে আমার বডিগার্ড বানিয়েছে। আজ রাত বারোটা পর্যন্ত সময় দিয়েছে, এর মধ্যে বেরিয়ে যেতে হবে শহর থেকে।'

চট করে হাত ঘড়ি দেখে নিল ডিকসি। আরেকবার তাকাল বারডুর দিকে। 'তাহলে, তো আপনার সময় হয়ে গেছে।'

'না,' বারডুকে গুনিয়ে জোরে জোরে বললাম, 'বারোটা এক মিনিট পর্যন্ত এখানেই থাকবে। আমার কান ছেঁড়ার একটা সুযোগ দিতে চাই ভালুকটাকে। তারপর ওর ঠ্যাঙ ভাঙব আমি।'

আমার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল বারডু। টেবিলে পড়ে থাকা খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাল।

রিনি চলে গেল। নিচু গলায় আলাপ চালালাম আমি আর ডিকসি। আশ্চর্য! খুনের কথা একবারও উঠল না। যার যার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে প্রশ্ন, কার বাড়ি কোথায়, বড় হয়েছি কিভাবে, ভবিষ্যতে কি করার ইচ্ছে, এই সব।

কোথা দিয়ে সময় পেরিয়ে গেল, খেয়ালই করলাম না। টেবিলে কালো একটা ছায়া পড়তেই মুখ তুললাম। বারডু এসে দাঁড়িয়েছে টেবিলের কাছে। ঘড়ি দেখলাম। বারোটা বেজে এক মিনিট। আবার তাকলাম ওর দিকে।

'প্রথমে কোনটা ছিঁড়ব, দোস্ত?' খসখসে গলায় জানতে চাইল ভালুক।

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে গেলাম চেয়ারে। ডান পা বাড়িয়ে জুতোর ডগা

আটকালাম বারডুর হাঁটুর পেছনে। হ্যাচকা এক টান দিতেই বেশামাল হয়ে পড়ল সে। সময় পেয়ে আর দেরি করলাম না, উঠে দাঁড়ালাম এক লাফে।

আমার মুখ লক্ষ্য করে ডান হাত চালান সে।

চট করে মুখ সরিয়ে ফেললাম, প্রায় একই সঙ্গে ঘুসি চাললাম তার গলায়।

ভালুকের মতই গৌ গৌ করে উঠল বারডু, ঝটকা দিয়ে দুই হাত উঠে গেল গলার কাছে, চেপে ধরল আহত জায়গা। ডান হাতের আঙুল সব সোজা রেখে ছুরি চুকিয়ে দেয়ার মত করে খোঁচা মারলাম তার তলপেটে, পরক্ষণেই বা হাতে ডান কানে ঘুসি।

পর পর তিনটে মারাত্মক আঘাত, সহিতে কষ্ট হচ্ছে বারডুর। তাকে সোজা হওয়ার সময় দিলাম।

পুরোপুরি সোজা হতে পারল না, হারও মানল না। টলতে টলতে এগিয়ে এল ঘুসি বাগিয়ে।

বাড়ানো হাতের কজি ধরে ফেললাম। আমি ঘুরতেই তার হাতটা চলে এল আমার কাঁধের ওপর। পিঠ বাঁকা করে আমার পেছনটা ঠেকালাম তার পেটের সঙ্গে, বিশেষ কায়দায় একটা ঝাঁকুনি দিতেই মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল জরি শরীরটা। ময়দার বস্তার মত ধাপাস করে মাটিতে আছড়ে পড়ল।

তড়পাতে তড়পাতে কোনমতে উঠে বসল ভালুক। মাথা ঝাড়া দিচ্ছে। দুই লাফে এগিয়ে গেলাম। জুতোর ডগা দিয়ে তার ডান কানের সামান্য নিচে আলতো ঠোকর লাগাতেই দু-দিকে হাত ছড়িয়ে পড়ে গেল, আর উঠল না। পনেরো মিনিটের আগে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না।

কাছেই একটা টেবিল। তাতে পরিজ। পাত্রটা তুলে উল্টো করে চেলে দিলাম বারডুর মাথায়। চূলে, কানে মাথামাখি হয়ে গেল হালুয়া।

ফিরে দেখলাম, চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে রিনি। ভূত দেখছে যেন।

'চমৎকার দেখিয়েছ, খোকা, ভেরি গুড।' দরজার কাছ থেকে শোনা গেল শেরিফের উজ্জ্বলিত কণ্ঠ।

সহজেই খুঁজে বের করলাম সার্কাস পাটিটা। দুকলাম ক্যারান্ডান দিয়ে ঘেরা সীমানার ভেতর।

দারোয়ানকে আমাদের পরিচয় দিলাম, খবর পাঠলাম ভিন কার্টারকে। তারপর ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম কি কি আছে। অনেক জন্তু-জানোয়ার। কয়েকটা দুশ্চাপ্য জীব দেখা গেল, যা অনেক চিড়িয়াখানাতেও নেই।

প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল একটা কুকুরের মত জন্তু। কালচে চামড়া, বুক আর দু-পাশে সাদা সাদা দাগ। এর নাম টাসম্যানিয়ান ডেভিল, ভেড়া আর খরগোশের যম। দেখলাম মালয়ের সিভেট ক্যাট, মেরু-শেয়াল, ছোট লেজওয়ালা

বেজি, ধোঁয়াটে চিতা, আঁশওয়ালা পিপিলিকাভুক, লিনসাং টামাকু, দুটো পিগমি মোষ, একটা ব্যাবিরুসা, হাঁসের মত ঠোঁটওয়ালা গ্ল্যাটিপাস, ছটা ব্যাক্তিকুট, প্রায় দশ ফুট লম্বা আর তিনশো পাউণ্ড ওজনের একটা কমোডো ড্রাগন, আর কয়েকটা মনিটর লিজার্ড—বৃহৎ আকৃতির গোসাপ, ওজনে, আয়তনে কমোডো ড্রাগনের অর্ধেক।

পেছনে পায়ের শব্দ হলো। ফিরে তাকালাম। সিক্কের সাদা শার্ট আর আঁটো প্যান্ট পরা লম্বা একজন লোক এগিয়ে আসছে। পায়ে চকচকে কালো বুট। কাছে এলে হাত বাড়িয়ে দিলাম, 'মিস্টার কার্টার?'

জবাব দেয়ার আগে আমাকে ভালমত দেখল লোকটা। 'আপনাকে তো চিনলাম না?'

'আমি রানাগাটের নতুন ডেপুটি শেরিফ,' নাম বলার প্রয়োজন মনে করলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার আমার খবর শুনেছেন?'

কঠিন হলো কার্টারের চোয়াল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। অবচেতন মন হুঁশিয়ার করে দিল আমাকে: বিপজ্জনক লোক; সাবধান!

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কার্টার। 'শুনেছি। শেরিফের মেসেজ পেয়েছি গতকাল। তবে আগেই জেনেছি, খবরের কাগজে। তো, আপনার আসার কারণ?'

'কিছু যদি মনে না করেন, কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।'

দারোয়ানের দিকে তাকিয়ে বলল সে, 'এদিকটা দেখো'। আমার দিকে ফিরে বলল, 'আসুন।'

কার্টারের হাটার ভঙ্গিতে মিলিটারি ডবল মার্চের দ্রুততা। ছোট একটা তাঁবুতে নিয়ে এল আমাকে। ক্যানভাস চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলল। 'ড্রিংক?'

'দিতে পারেন।'

দুটো গেলোসে মদ ঢেলে একটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল সে। মুখোমুখি আরেকটা চেয়ারে বসল। 'বলুন, কি জানতে চান?'

'রোববার রাতে কোথায় ছিলেন?'

'পথে। পার্টির সঙ্গে।'

'কোথায় যাচ্ছিল পার্টি?'

'এখানে আসছিল। শেষরাতে পৌঁচেছি আমরা।'

'একটানা নিশ্চয় চলতে পারেন না, মাঝে মাঝে থামতে হয় আপনাদের। কতক্ষণের জন্যে থামেন?'

'প্রতি এক ঘণ্টা পর, দশ মিনিট করে। গাড়ির টায়ার, জন্তু-জানোয়ারের খাঁচা চেক করে নিই ও-সময়।' কোনদিকে তাকে নিয়ে যাচ্ছি আমি, বুঝতে পারছে কার্টার, কিন্তু সেটা প্রকাশ করছে না। সোজাসুজি জবাব দিচ্ছে। 'পেপারে পড়েছি, তিনজনকে সন্দেহ করা হচ্ছে।'

'হ্যাঁ। আপনার মামাতো বোন ডিকসি, অ্যালেন কিনি আর স্টার লেভিট।'

গেলোসের ওপর দিয়ে আমার দিকে তাকাল লেভিট। কঠোর হয়ে উঠেছে দৃষ্টি। 'আশা করি খুনীকে ধরতে পারবেন?'

জবাবটা ছুঁড়ে শিলাম তার দিকে, 'কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হাতকড়া পরাব।'

'তাই নাকি!'

হাসলাম। 'ভাবছেন না তো আবার আপনাকে সন্দেহ করছি?'

শ্রাগ করল কার্টার। 'একজন মানুষ খুন হলে অনেককেই সন্দেহ করা হয়। মামা আমাকে দেখতে পারত না, অনেকেই তা জানে। আমার বাপকেও দেখতে পারত না বুড়ো। তার মৃত্যুতে আমার লাভ লোকসান কিছুই নেই। সম্পত্তি যদি দিয়েও যেত, ভোগ করতে পারতাম না। সার্কাসের জগৎ ছেড়ে কোথাও আমি যাব না।'

'আপনার ওই কমোডো ড্রাগনটা দেখলে ভয় লাগে। মাংস খায় বুঝি?'

ভুরু কঁোকাল কার্টার। তাকিয়ে আছে আমার মুখের দিকে। মাথা ঝাঁকাল, 'হ্যাঁ, খায়। লোকে বলে খোড়া-মানুষ কোন কিছুকেই পরোয়া করে না ওরা। যা পায়, তাই মেরে খায়। এটা অবশ্য লোকের বাড়িয়ে বলা। তবে, দুনিয়ার ভয়ঙ্করতম কয়েকটা জীবের একটা ওই ড্রাগন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কাছাকাছি কেউ না থাকলে ওর গর্তে আমিও নামব না।'

কার্টারের বলার ভঙ্গিতে শিরশির করে উঠল আমার গাড়ের কাছটা।

'আর কোনও প্রশ্ন? জিজ্ঞেস করল কার্টার।'

'হ্যাঁ। স্টার লেভিটের কাছ থেকে শেষ কখন খবর এসেছে আপনার কাছে?'

চেয়ারে সামান্য নড়েচড়ে বসল কার্টার। 'ও আমাকে খবর পাঠাবে এ-ধারাণা হলো কেন আপনার? ওকে চিনিই না আমি।'

'রিনিকেও নিশ্চয় চেনেন না?'

এতক্ষণ কঠোর ছিল কার্টারের চাহনি, এখন বরফ-শীতল হয়ে গেল। বরফের মাঝেই আগুনের ঝিকিঝিকি আভা। 'না, ও চিনি না।'

মোলোয়েম গলায় বললাম, 'আপনাকে কিন্তু ওরা দু-জনেই চেনে। লেভিটের ব্যাপারে সাবধান থাকবেন। ও বড় ভয়ঙ্কর লোক। শিকাগো শহরেও বহু লোককে জ্বালিয়ে এসেছে। তার পথে বাধা হলে আপনাকেও নিস্তার দেবে না।'

একটু যেন চমকে গেল সে। তাকে সামলানোর সুযোগ না দিয়েই বললাম, 'আপনাদের কিছু গোপন কথা জানি আমি। টাকাগুলো হাতাতে যাচ্ছেন আপনারা। তবে বলা যায় না, আপনাকেও বুড়ো আঙুল দেখাতে পারে লেভিট, পুরোটাই কেড়ে নেবে। হুঁশিয়ার করে দিলাম।'

'অনেক বেশি জানেন আপনি! মুখ বিকৃত করে ফেলেছে কার্টার, কুৎসিত হয়ে উঠেছে সুন্দর চেহারা। 'ছোট্ট শহরের অতি সাধারণ এক ডেপুটি শেরিফ, বড় বেশি কঠিন কাজে হাত দিয়ে ফেলেছেন।'

গুধু হাসলাম, কিছু বললাম না।

কার্টারের সঙ্গে আর কোন কথা নেই আমার। বললাম, 'এবার যেতে হবে। উঠি। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

কিসের দেরি, জানতে চাইল না কার্টার। 'ঠিক আছে। প্রমাণ জোগাড় করতে পারলে আসবেন আবার, আমাকে ধরে নিয়ে যাবেন।'

'তা তো আশ্বই,' হেসে বললাম। 'ভাববেন না, তাড়াতাড়িই আসব।'

আমাকে এগিয়ে দেয়ার জন্যে সঙ্গে এল কার্টার। জন্তু-জানোয়ারের খাঁচার ধার দিয়ে এগিয়ে চলেছি, আমার পেছনেই রয়েছে সে। নীরবতার মধ্যে তার নিঃশ্বাসের ভারি শব্দ কানে আসছে।

ড্রাগনের গর্ভের কাছাকাছি আসতেই নাকে লাগল বোটকা পচা গন্ধ। বাতাসে উড়ছে তাঁবুর কানা, পতপত শব্দ হচ্ছে। গর্ভটার দিকে চেয়েই থমকে দাঁড়লাম। পেছনে রয়েছে কার্টার, ধাক্কা দিয়ে যদি গর্ভে ফেলে দেয় আমাকে? দ্রুত সরে গেলাম দূরে।

ব্যাপারটা টের পেল কিনা সে, জানি না, তবে পেলেও প্রকাশ করল না।

গাড়ির কাছে এসে দাঁড়লাম।

'আপনার ধারণা, আমি মামাকে খুন করেছি?' আচমকা প্রশ্নটা যেন ছুঁড়ে দিল কার্টার।

'হ্যাঁ।'

প্রমাণ করতে পারবেন?'

জবাব দিলাম, 'আটি আটি, সোবাটি বিবিন সালাহ!'

ঝট করে মুখ তুলল কার্টার। স্থির হয়ে রইল এক মুহূর্ত। তারপর কোন কথা না বলে ঘুরে হাঁটতে শুরু করল তাঁবুর দিকে।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে তার চলে যাওয়া দেখলাম। একটা খাঁচার কাছে দাঁড়িয়ে আছে দারোয়ান, আমার দিকে নজর। তার কাছে এসে দাঁড়লাম। লাইটার আছে আমার পকেটে, তবু জিজ্ঞেস করলাম, 'ম্যাচ আছে?'

নীরবে পকেটে হাত দিল সে।

একটা সিগারেট দিলাম তাকে।

দেশলাই বের করে কাঠি জ্বেলে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল লোকটা।

'পারিটা কয়েক দিন আগে না ভেগাসে ছিল, তাই না?' জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ। ওখান থেকে এসেছেন?'

'না। তবে ওদিকের পথ ধরেই এসেছি। রাস্তা খুব খারাপ দেখলাম।'

'হ্যাঁ। বার বার থামতে হয়।'

'টায়ার, খাঁচা চেক করার জন্যে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো খুব বিরক্তিকর।'

'আর বলবেন না। এক-আধ ঘণ্টা পর পরই যদি থামতে হয়, আধঘণ্টা করে

নষ্ট হয়, কেমন বিরক্ত লাগে! মাঝে মাঝে আরও দেরি হয়। এভাবে চলতে ভান্নাগে!'

'নাহ্। আচ্ছা, চলি।' গাড়ির দিকে রওনা হলাম আবার।

একেকবার থামলে কতটা সময় নষ্ট হয়, এ-ব্যাপারে মিথ্যে কথা বলতে কার্টার। কেন? হঠাৎ বুঝে গেলাম ব্যাপারটা। খাপে খাপে মিলে গেল অনেক কিছু।

পশ্চিম দিকে ছুটে চলেছে গাড়ি। দীর্ঘ যাত্রা। দু-পাশে মরুভূমি, পাহাড়, মাঝে মাঝে ছোট্ট ওয়েস্টার্ন শহর।

এক জায়গায় পাহাড়ের ভেতর দিয়ে চলে গেছে পথটা। সামনে একটা বাঁক। গতি কমালাম। মোড় নিতেই চোখে পড়ল গাড়িটা। রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছড় তোলা। এদিকে পেছন ফিরে ইঞ্জিনের ওপর যুঁকে দাঁড়িয়ে আছে একটা মেয়ে।

এতরাতে এরকম জায়গায় মেয়েমানুষ! নিশ্চয় গাড়ি খারাপ হয়ে বিপদে পড়েছে।

গাড়ি ধামিয়ে নেমে গিয়ে দাঁড়লাম মেয়েটার পেছনে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হয়েছে?'

ঝটকা দিয়ে সোজা হলো মেয়েটা। পাঁই করে ঘুরল। হাতের পিস্তল নাচিয়ে বলল, 'হয়নি এখনও, তবে হবে!'

রিনি!

পায়ের আওয়াজ হলো। পাশ ফিরে দেখলাম একটা বড় পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে কেপ বারডু। তার হাতেও পিস্তল।

রাতের বেলা রাস্তার ওপর গাড়ি ধামিয়ে ইঞ্জিন খারাপের ভান করে অন্য গাড়ি থামানো একটা অতি সহজ কৌশল, খুব ভাল করেই জানি আমি, তারপরেও বোকার মত ফাঁদে পা দিলাম।

অন্য একটা পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল আরও একজন, ওকে চিনি না।

'চলো, টিকটিকি,' আদেশ দিল বারডু, 'ওদিকে চলো। পথের ওপর কাজ সারতে পারব না।'

প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরের ছোট একটা টিলার অন্য পাশে নিয়ে এল আমাকে ওরা। এখান থেকে পথটা দেখা যায় না।

'এইবার শুরু করো,' হাসি হাসি গলায় বলল বারডু। 'যা যা জানো, গড়গড় করে উগড়ে দাও তো। পেটে রেখে আর কি করবে,' হাতের পিস্তলটা নাড়ল সে। 'প্রথমে বেলো, কার্টারকে কি বলেছ?'

'বলেছি, সে রট হ্যানসনকে খুন করছে। জিজ্ঞেস করছি, লেভিট তার কাছে কি চায়, শেখবার কখন যোগাযোগ করেছে। ওকে তোমরা বোকা ভেবে ভুল করছ। ভুল লোকের সঙ্গে যোগ দিয়েছ। আমি অবশ্য এই ভুলটা করব না।'

‘কি বললে?’ এক পা এগিয়ে এল রিনি।

‘এত সহজ কথাটা বুঝলে না? লেভিটের দলে ভিড়তে চেয়েছিলাম, পাভা দেয়নি সে। দু-চারশো টাকা দিয়েই আমার মুখ বন্ধ করতে চেয়েছে। কিন্তু কার্টার ভদ্রলোক। সে ভাল টাকা দিতে রাজি হয়েছে। তোমাদেরও তাই করা উচিত। কার্টারের দলে ঢুকে যাও।’

বারুডু বলল, ‘স্টার লেভিটের সঙ্গে বেঙ্গামানী!...না বাবা, আমি তারই লোক। এখনও আরও কিছুদিন বাঁচার সাধ আছে।’

‘সে বাঁচবে কিনা সেটা জানো? শোনো, ভাল চাও তো যা বলছি করো। কার্টারের সঙ্গে ভিড়ে যাও।’

ধাধা দেয়ার চেঁচা করছি বটে, কিন্তু কতখানি সফল হব জানি না। ওরা আমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছে, বুঝতে পারছি। কথা বলে যতক্ষণ দেরি করতে পারি ততই লাভ। কতক্ষণ বাঁচিয়ে রাখবে আর জানি না। রিনির দিকে ফিরে বললাম, ‘তোমাকে এখানে দেখব আশা করিনি।’

‘চূপ!’ ধমক দিল বারুডু। ‘বড় বেশি কথা হলো!’

‘ওকে বলতে দাও,’ রিনি বলল। ‘যা যা জানে, বলুক না।’

‘কি আর বলব, তোমাদের মত আমিও টাকার জন্যেই দল বদল করতে চাইছি। লেভিট আমাকে দাম দেয়নি। ফাঁকিঝুঁকি দিয়ে পণ্ডকে রাজি করিয়ে তার ডিপুটি হয়ে গেলাম। রানাগাটে থাকব, অন্তত টাকার বখরা যতদিন না পাব যাব না। লেভিটকে কেউ চায় না। পণ্ড, বুড়ো কিনি এবং আরও দু-চারজন খনির মালিক, সবাই চায় লেভিটকে শহর থেকে বের করে দিতে। কোন একটা ছুঁতোয় যদি খুন করে ফেলতে পারে, তাহলে ওদের জন্যে আরও ভাল। চিরতরে আপদ বিদেয় হবে। যত চেঁচাই করুক, দিন করয়েকের বেশি আর রানাগাটে টিকতে পারছে না লেভিট। তখন টাকার বখরা কার কাছ থেকে নেবে? একমাত্র লোক, ভিন কার্টার।’

‘কিন্তু,’ প্রতিবাদ করল বারুডু, ‘কার্টারের কাছে যে উইল্টা আছে, তাতে লেখা, বুড়ো হ্যানসন তার সম্পত্তি ভাগ্যেই দিয়ে গেছে। নগদ টাকাও। বৈধ জিনিস, ওই টাকার ভাগ কেন সে দিতে যাবে আমাদের?’

‘দেবে, আমি তাকে দিতে বাধ্য করব। কারণ, আমি প্রমাণ করতে পারব, হ্যানসনকে খুন করেছে কার্টার।’

‘কি করে?’

দরাজ হাসি হাসলাম। ‘সেটা এখন বলব কেন? আগে আমাকে সাহায্য করো, তখন বলব।’

‘না,’ কর্কশ গলায় বলল বারুডু। ‘তোমাকে মেঝে ফেলার আদেশ হয়েছে আমাদের ওপর, তাই করব।’

‘দাঁড়াও রেপ,’ হাত তুলল রিনি। ‘একটা কথা ভাবছি। ধরো, এখানে ওকে

মারলাম না আমরা, শহরে ধরে নিয়ে গেলাম। কাফের নিচে ভাঁড়ারে আটকে রাখলে কেউ জানবে না। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবার সময় পাব আমরা, খোঁজখবর করব। লেভিটকেই বা কেন পুরোপুরি বিশ্বাস করতে যাব? সে কি অতটা বিশ্বাসী?’

‘এ-ব্যাপটা মিছে কথা বলছে না, কি করে জানব? ধাধা দিয়ে...’

‘দাঁড়াও, দেখি মিথ্যে কিনা,’ আমার দিকে ফিরল রিনি। ‘তুমি বলছ, কার্টারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছ। তারমানে আগে থেকেই ওর সঙ্গে তোমার যোগাযোগ। উইল্টা সম্পর্কেও নিশ্চয় জানো তাহলে। কি জানো, বলো।’

ঠাণ্ডা ঘাম বেরোতে শুরু করল। এইবার পড়েছি ফাঁদে। এটা ঠিকমত বলতে না পারলে একপর আমার একটা কথাও আর বিশ্বাস করবে না ওরা। এখানেই খুন করে রেখে যাবে। ভয় যে পেয়েছি, সেটা বুঝতে দিলাম না ওদেরকে।

পাথে এক জায়গায় সাইনবোর্ড দেখেছি:

জনি লীডার,

ওয়াল্টার্স গ্রেটেস্ট পেনম্যান।

‘লীডার’ নামটা সেদিন রাতে লেভিট আর রিনির মুখেও শুনেছি। সাইনবোর্ডে দেখার পর থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। ভেবেছি তাকে নিয়ে। যা থাকে কপালে ভেবে সেইটাই খেঁড়ে দিলাম, ‘কেউই জানে না, আমি জানব কি করে? তবে এটুকু জানি, ওই উইল্টা লিখেছে জনি লীডার। এ-ও জানি, হ্যানসনকে খুন করার পর উইল্টা গায়েব করে ফেলেছে কার্টার।’

মাথা দোলল রিনি, ‘স্টারেরও তাই ধারণা। রেপ, ও সত্যি কথাই বলছে।’

চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা একটু একটু করে ছাড়লাম।

অবশেষে মাথার ওপর থেকে হাত নামাতে গিল আমাকে ওরা। গাড়ির কাছে নিয়ে এল। বিপদ এখনও কার্টেনি পুরোপুরি, তবে আপাতত বেঁচে গেলাম। সময় পাওয়া গেল। মুক্তির সুযোগ আসতে পারে।

‘রিনি,’ বারুডু বলল, ‘আমি এই উজ্জ্বলটার গাড়িতে চড়ছি। তুমিও এসো আমার সঙ্গে। আমাদেরটা রিকি চালাবে। চলো, আগে রানাগাটে যাই।’

আমার গাড়ির ড্রাইভিং সীটে বসল রিনি। ওর পাশে আমাকে বসতে হলো। বারুডু বসল পেছনের সীটে। আমার ০৪৫টা রয়েছে সামনের দুটো সীটের মাঝের ফাঁকে, লুকানো।

গাড়ি ছুটে চলল। মনে মনে নানা রকম ফন্দি আঁটছি। ওই কাফের নিচে ভাঁড়ারে আটকা পড়ে থাকলে কিছুই করতে পারব না। সূত্রাং ওখানে ঢোকা চলবে না। ঠেকাতে হবে। কিন্তু কিভাবে?

ভাবার সময় পেলাম না, কথা বলে উঠল বারুডু, ‘রিনি, শেরিফ আর কিনি যে তাকে খুন করতে চায়, এটা কিন্তু লেভিট জানে না। সে ভাবছে, ডিকসিকে খুন করে সহজেই পাড় পেয়ে যাবে। আত্মহত্যার মত করে সাজাবে কেসটা—চাচাকে খুন করে অনুশোচনায় ভুগে ভুগে, যন্ত্রণা সহিতে না পেরে, ছোট্ট একটা চিঠি লিখে

রেখে আত্মহত্যা করেছে ডিকসি।’

পেছনে খস করে দিয়াশলাইর কাঠি জ্বলে উঠল। সিগারেট ধরিয়ে আবার বলল বারুড়, ‘আজ রাতেই মেয়েটাকে খুন করবে লেভিট।’ রাতের বেলা চুরি করে র্যাক্ষে চুকেছিল ডিকসি, এটা জেনে গেছে সে।’

‘রিনি কিছু বলল না।’

‘কি করে জানল?’ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম বারুড়কে। হাতটা চলে গেল সীটের ফাঁকে, পিস্তলটা ঠেকল আঙুলে।

‘গ্যারেজের জানালার নিচে খিঁজ ছিল, তাতে পা দিয়ে ফেলেছিল মেয়েটা। সারা বাড়ি ছড়িয়েছে পায়ের ছাপ। লেভিটের ঘরের জানালার নিচেও পড়েছে।’

ও, এই তাহলে কারণ। এতক্ষণে বুঝলাম, হঠাৎ করে আমার ওপর খেপে গেল কেন লেভিট, কেন পাগল হয়ে উঠল শহর থেকে তাড়ানোর জন্যে। ইস, ডিকসিকে সঙ্গে নিয়েই ভুল করেছে। না লেনি এখন এই ঝামেলায় পড়তে হত না।

খানিকক্ষণ নীরবতা। হঠাৎ আমার দিকে ফিরল রিনি। ‘ওই মেয়েটাকে তোমার পছন্দ, না?’

‘ওকে?’ খাণ করলাম। ‘না। বরং তোমাকেই আমার পছন্দ। স্মার্ট মেয়ে ভাল লাগে আমার।’

ড্যাশবোর্ডের সবুজ আলোয় পরিবর্তন লক্ষ করলাম রিনির চেহারায়া। প্রিন্সের মত চেহারা নয় আমার, তবে লেভিটের তুলনায় গরিলার পাশে দেবশিশু, এটা স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই। হাসলাম মনে মনে। টিলটা জায়গামতই লেগে গেল বোধহয়।

ভোরবেলা পৌঁছলাম রানাগাটে। অফিসের দরজায় দাঁড়ানো দেখলাম শেরিফকে। আমাদের গাড়ির দিকে চেয়ে আছে।

পাশ ফিরে তাকালাম। একটা কালো কনভারটিবল গাড়ি চোখে পড়ল। কার্টারের ওখানে দেখেছি ওটা গতরাতে। ক্যারানানগুলোর কাছে রাখা ছিল। চট করে পেছন ফিরে তাকালাম। ডান কনুই সীটে রেখে কাত হয়ে বা হাতে পকেট হাতড়াচ্ছে বারুড়। ঠোঁটে নতুন সিগারেট, তারমানে দিয়াশলাই খুঁজছে।

চোখের পলকে পিস্তলটা বের করে আমলানাম সীটের ফাঁক থেকে। হাতলে মোচড় দিয়ে এক ধাক্কাই খুলে ফেললাম বাঁ পাশের দরজা। একই সঙ্গে ডান কনুই দিয়ে আঘাত করলাম রিনির স্টিয়ারিং ধরা হাতে।

অকস্মাৎ ঘুরে গেল গাড়ির নাক। পাশের একটা দেয়ালের দিকে ছুটে যাচ্ছে। ততক্ষণে আমি বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। পড়েই এক গড়ান দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। হাতে উদ্যত পিস্তল।

ধাম করে গিয়ে দেয়ালে গুঁতো মারল গাড়িটা। চুরচুর হয়ে গেল উইণ্ডশিল্ড। পাশ কেটে শা করে বেরিয়ে গেল রিকির গাড়ি।

চিৎকার করে বললাম শেরিফকে, ‘গুলি করুন, গুলি করুন ব্যাটাকে! পালান্ছে

তো!’

‘বেইমান! হারামজাদা!’ বারুড় চিৎকার করছে। জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসছে পিস্তলধরা হাত।

পর পর দু-বার গুলি করলাম বুক সহী করে।

হাঁ হয়ে গেল বারুড়র মুখ। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল তার পাশের দরজা। গড়িয়ে রাস্তায় পড়ল রক্তাক্ত লাশটা। ধুলোর মধ্যে।

একটানা আওয়াজ হচ্ছে পিস্তলের গুলির। গুলি করে চলেছে শেরিফ। রিকির গায়ে লাগল কিনা, দেখার সময় পেলাম না। আমার নজর রিনির দিকে। হেঁা মেরে পাশে রাখা হাতব্যাগটা তুলে নিয়েছে।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল সে। ততক্ষণে আমিও পৌঁছে গেছি। ব্যাগটা খোলার আগেই কেড়ে নিলাম। চিতার মত ফুঁসে উঠল রিনি। ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। নাকেমুখে খামচি মারতে লাগল। মাথা সরানোর সময় পেলাম না, গালের চামড়া ছিলে দিল। আমার এক হাতে ব্যাগ আরেক হাতে পিস্তল, রিনির হাত ধরতে পারছি না।

দু-পাশ থেকে এসে রিনির দু-হাত চেপে ধরল শেরিফ আর একজন খনি-শ্রমিক। টেনে সরিয়ে নিল আমার সামনে থেকে।

‘ধরে রাখুন!’ চেষ্টায়ে বললাম। ‘সে-ও জড়িত!’

‘ডিকসিকে দেবেই?’ আমাকে জিজ্ঞেস করল শেরিফ। ‘তাকে পাওয়া যাচ্ছে না!’

‘দেখিনি, তবে জানি কি হয়েছে। ধরে নিয়ে গেছে লেভিট।’ শেরিফের গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ, খারাপ হয়ে গেছে কিনা জানি না। সেটা পরখ করে দেখারও সময় নেই এখন।

পথের পাশে সামান্য কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কালো কনভারটিবল। ছুটে গিয়ে হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেললাম ওটার দরজা। চাবি রয়েছে জায়গামত। মোচড় দিতেই স্টার্ট হয়ে গেল। বনবন করে স্টিয়ারিং ঘোরালাম, গাড়ি উঠে এল পথে।

গাড়ি নিয়ে গেট ভেঙে চুকে পড়লাম লেভিটের র্যাক্ষ হাউসের আড়িনায়। বাড়ির ভেতরে কিছু একটা ভাঙার শব্দ হলো। আতনাদ করে উঠল একজন মানুষ। আরেকটা কিছু ভাঙল। আবার চিৎকার।

গাড়ি থেকে নেমেই ছুটলাম। লাফিয়ে সিঁড়ি টপকে বারান্দা পেরিয়ে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারলাম সদর দরজায়। কাঁচ ভাঙল, কজা থেকে ছুটে গেল পাল্লা, প্রায় হুমড়ি খেয়ে গিয়ে ভেতরে পড়লাম আমি।

উপড় হয়ে কার্পেটের ওপর পড়ে আছে ভিন কার্টার। রক্তাক্ত শরীর। গোটা দুই চেয়ার ভেঙে পড়ে আছে তার কাছাকাছি। আধভাঙা আরেকটা চেয়ার লেভিটের হাতে। বাড়ি মারার জন্যে তুলেছিল, সে অবস্থায়ই স্থির হয়ে গেল।

ফিরল আমার দিকে। ভাঙা চেয়ারটা হাতে নিয়ে এগোল।

পিস্তল তুললাম, কিন্তু গুলি করার সময় পেলাম না। তার আগেই চেয়ারের বাড়ি খেয়ে হাত থেকে উড়ে চলে গেল পিস্তলটা। দ্বিতীয়বার চেয়ার তুলল সে। পাশে সরিয়ে মাথাটা বাঁচাতে পারলাম কোনমতে, কিন্তু কাঁধ বাঁচল না। আঙুল লাগিয়ে দিল যেন কেউ ডান কাঁধে।

ক্ষণিকের জন্যে দিশেহারা হয়ে গেলাম। ওই দানবের সঙ্গে খালি হাতে লড়াই করতে পারব বলে মনে হলো না।

আমার অসহায় অবস্থা দেখে হাসল লেডিট। হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল চেয়ারটা।

লাফিয়ে তার সামনে চলে এলাম। দ্রুত ঘুসি মারলাম চারবার। দু-বার তার বুকে, দু-বার পেটে।

কিছুই হলো না লেডিটের, হাসি একান-ওকান হলো। ধীরে সূস্থে এগোল আমার দিকে।

হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আমার কাঁধ খামচে ধরল। হ্যাঁচকা টানে এনে ফেলল বুকের ওপর। দু-হাতে জড়িয়ে ধরে পিষতে শুরু করল। ভয়ঙ্কর ঘিঞ্জলি ভালুকের বাহুবন্ধনে আটকা পড়েছি যেন। বেরোনোর জন্যে হাঁসফাঁস করণ্ড কিছুই করতে পারলাম না।

ছেড়ে দিল আমাকে লেডিট। প্রচণ্ড এক ঘুসি খেলাম নাকেমুখে। পলকের জন্যে আঁধার হয়ে গেল দুনিয়া। মাথা ঝাড়া দিয়ে আবার চোখ মেলতেই চুলে হ্যাঁচকা টান পড়ল। পরমুহুর্তে নিজেকে আবিষ্কার করলাম লেডিটের মাথার ওপর। উড়ে গিয়ে দেন্যালে বাড়ি থেখো আমার দেহটা। ওখান থেকে ধপ করে পড়লাম মেঝেতে।

হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে বসলাম, মাথা ঝাড়া দিয়ে পরিষ্কার করতে চাইলাম জড়তা। আগের জায়গায়ই দাঁড়িয়ে আছে লেডিট। হাসছে।

উঠে দাঁড়ালাম। হাঁটু কাঁপছি। দেন্যালে হেলান দিয়ে জিরিয়ে নিলাম পাঁচ সেকণ্ড। আমাকে সময় দিল লেডিট, এবং দিয়েই বোকামিটা করল।

দৌড় দিলাম সামনে। লেডিটের কাছ থেকে কয়েক ফুট দূরে এসে লাফিয়ে উঠলাম শূন্যে। শূন্যেই ডিগবাজি খেলাম। এতই আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল লেডিট, সাবধান হয়নি। ফলে পুরোপুরি লাগাতে পারলাম আঘাতটা। গলায় লাথি খেয়ে জানোয়ারের মত চিৎকার করে উঠল সে। মেঝেতে পড়েই লাফিয়ে সোজা হয়ে দেখলাম, দু-হাতে গলা ধরে টলছে দানব।

দ্বির হওয়ার সময় দিলে আর সুযোগ পাব না। আবার ছুটে গেলাম। গায়ের জোরে লাথি মারলাম দুই উরুর ফাঁকে। হিঁক করে অমানুষিক একটা চিৎকার বেরোল তার মুখ থেকে। কঁজো হয়ে গেল সামনে। দা দিয়ে কোপানোর মত করে হাতের পাশ দিয়ে মারলাম ভীষণ মোটা ঘাড়টাকে। প্রচণ্ড ব্যথা পেলাম হাতে, শক্ত

রবারের নিরোট পাইপে আঘাত করেছি যেন।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল লেডিট।

একটা চেয়ার তুলে নিয়ে নির্দিধায় বাড়ি মারলাম মাথায়। তারপর মেঝে চললাম শরীরের যত্নতত্র। মটমট করে কাঠ ভাঙছে। থামলাম না। উঠতে দেন্যা চলবে না কিছুতেই।

‘ব্যস ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে,’ পেছন থেকে বলে উঠল শেরিফ।

ভাঙা চেয়ারটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে ফিরলাম।

তার হাতে উদ্যত পিস্তল। হাসি হাসি মুখ। এসেছে বেশ কিছুক্ষণ আগে।

পিস্তি জ্বলে গেল রাগে। ‘দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেতে দেখলেন, কিছু করলেন না!’

‘দেখতে চেয়েছিলাম স্টারকে পেটানোর ক্ষমতা কারও আছে কিনা,’ শেরিফের হাসি বাড়ল। ‘সরি।’

গোঙানি শোনা গেল লেডিটের। ফিরে চেয়ে দেখলাম, নড়ছে। চেষ্টায়ে উঠলাম, ‘জলদি হাতকড়া লাগান! ও আবার উঠলে জানালা দিয়ে পাল্য আমি!’

একটা ঘরে বন্দী ডিকসিকে খুঁজে পেলাম। আমাকে দেখেই ছুটে এল সে, জড়িয়ে ধরল। বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলল, ‘বিল...বিল তুমি এসেছ।’

ডিকসির মুখ তুলে চুমু খেতে গেলাম। ব্যথা করে উঠল আমার কাটা খেঁতলানো ঠোঁট। মিষ্টি ব্যাপারটা আর মিষ্টি লাগল না।

কয়েক ফটা পর। কাফেতে বসে কফি খেতে খেতে কথা বলছি। টেবিল ঘিরে বসেছে শেরিফ, বুড়া অ্যালেন কিনি আর ডিকসি।

গায়ের ব্যথা বেড়েছে আমার। দেন্যালে আছাড় দিয়ে হাড়গোড় সব যেন ভেঁড়ে করে ফেলেছে হেডিট।

‘পূবে একটা খুন করে এসেছিল স্টার,’ বলল শেরিফ। ‘পালিয়ে এসেছিল রানাগাটে। খুঁতখুঁতে একজন গোয়েন্দা ব্যাপারটার তদন্ত করছিল, আরও তিনটা খুনের সঙ্গে প্রায় জড়িয়ে ফেলেছিল স্টারকে। অবশেষে তাকেও খুন করল সে।’

পুলিশ বৃথল সবই, কিন্তু প্রমাণ করতে পারল না কিছু। ওখানে থাকার ঝুঁকি আর নিল না স্টার। চলে এল অনেক দূরে, এই শহরে।’ গালটা চুলকে নিয়ে বলল, ‘আরও একটা খুনের দায় তার ঘাড়ে চাপতে পারে। কার্টারের পাজরের তিনটে হাড় ভেঙেছে। একটা টুকে গেছে ফুসফুস ফুটো করে। বাঁচলে হয় এখন।...তো, তুমি বলছ, হ্যান্সনকে কার্টারই খুন করেছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘অসম্ভব!’ প্রায় চেষ্টায়ে উঠল কিনি। ‘আমার ঘরের সামনে দিয়ে সে যায়নি। তাহলে উঠল কোনখান দিয়ে?’

‘ঠিক!’ কিনির কথায় সুর মেলাল ডিকসি। ‘কোন পথে?’

‘আমারও সেই কথা,’ শেরিফ বলল। ‘রানাগাটে এসেছি তিরিশ বছর। ওই মেসার মাখায় অন্য কোন ভাবে কাউকে চড়তে দেখিনি। পথ ওই একটাই, কিনির বাড়ির সামনে দিয়ে।’

‘ও পথে যায়নি সে,’ জোর দিয়ে বললাম।

প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে তিনজোড়া চোখ।

সুযোগ পেয়ে ছোটখাট একটা বক্তৃতা ঝাড়লাম, ‘অনেক বছর ধরে অপরাধ আর অপরাধীদের নিয়ে কারবার করছি আমি। অনেক জায়গায় ঘুরেছি, অনেক কিছু দেখেছি, অনেক কিছু শিখেছি। অনেক ধরনের চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। মানুষের স্বভাব কত বিচিত্র, তার কিছুটা আমি জেনেছি। ভিন কাটার লোক আসলে খারাপ নয়। অভাবে স্বভাব নষ্ট, তার হয়েছে তাই। কয়েকটা বাজে দোষ আছে তার, যার ফলে প্রচুর টাকা নষ্ট করেছে। ঋণে জড়িয়ে পড়েছে। সেটা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে গিয়েই আমার ওপর নজর পড়েছে তার। জানে, মামা তাকে পছন্দ করে না, টাকা চাইলে দেবে না। আমার সঙ্গে তার যে রকম সম্পর্ক ছিল, তাতে তার মৃত্যুর পরও সম্পত্তি বা টাকা-পয়সা পাওয়ার কোন আশা ছিল না। কাজেই অন্য পথ ধরল। খুন করার সিদ্ধান্ত নিল মামাকে। তার উইল জাল করে টাকা হাতানোর ফন্দি করল।’

‘এখন আসি, কি করে হ্যানসনের কেবিনে ঢুকল কার্টার। কেবিনের পেছনে একটা ফাটল আছে, ফাটলের পাশে একটা অদ্ভুত দাগ দেখেছি। কি করে দাগটা হয়েছে প্রথমে বুঝতে পারিনি, বুঝলাম গত রাতে সার্কাসের ক্যাম্পে গিয়ে। দেয়াল বেয়ে মেসায় চড়েছে কার্টার।’

‘অসম্ভব!’ প্রতিবাদ করল শেরিফ। ‘ওই ঝাড়া দেয়াল বেয়ে কোন মানুষ উঠতে পারবে না।’

‘কিন্তু কার্টার পেরেছে,’ বললাম।

‘কেবিন থেকে কেউ তাকে সাহায্য করেছে?’

‘না।’

‘কার্টারই করেছে খুনটা, কি করে শিওর হলে?’

‘গত রাতে মালয়ী ভাষায় কার্টারকে বলেছিলাম, সাবধান! ডুল করেছে! শুনে এমন চমকে উঠল, বুঝে গেলাম, তারই কাজ। দীর্ঘদিন মালয়ের জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ার ধরেছে সে, ভাষাটা শিখতে হয়েছে।’

‘মালয়ী ভাষার সঙ্গে খুনের কি সম্পর্ক?’ জানতে চাইল কিনি। ‘লেভিটই বা কি করে ঢুকল এর মধ্যে?’

‘মালয়ী ভাষার সঙ্গে খুনের সম্পর্ক হলো একটা গোসাপ। আমার মতই লেভিটও বুঝে গিয়েছিল ব্যাপারটা। টাকার লোভ দেখিয়ে রিনিকে জড়াল প্রথমে, শাসানোর জন্যে পাঠাল কার্টারের কাছে। ব্লেকমেল।’

‘হ্যানসনের উইল চুরি করে কার্টারের কি লাভ?’ শেরিফ জানতে চাইল। ‘সে

তো জানে তাকে কিছুই দিয়ে যাবে না মামা।’

‘চুরিটা করেছেই তো সে-জনে। পেনম্যান জনি লীডারকে তো চেমনে, এক নম্বর জালিয়াত। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, কমপক্ষে আধডজন জালিয়াতির জন্যে তাকে খুঁজছে লস অ্যাঞ্জেলেসের পুলিশ। আসল উইলটা চুরি করে নিয়ে গেছে কার্টার। তার জায়গায় একটা নকল উইল রেখে গেছে। হ্যানসনের সেই জ্বাল করে দিয়েছে লীডার। সেটা রিনিও জানে।’

‘হাঁ! এন্ডার আসল কথায় এসো। মেসায় চড়ল কি করে কার্টার?’

‘একটা দানবীয় গোসাপের সাহায্যে। মনিটর লিজার্ভ।’

‘বলো কী!’ এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল শেরিফ আর কিনি।

‘হ্যাঁ, বিশ্বাস করা শক্ত,’ হেসে বললাম। ‘ভারতে বানরের সাহায্যে বড় বড় বিল্ডিঙের ওপর উঠে পড়ে চোর-ডাকাতরা। বানরের হাতে রশি ধরিয়ে দেয়। সেটা নিয়ে গিয়ে ওপরতলার জানালার শিকে বেঁধে দেয় ট্রেনিং পাওয়া বানর। চোর তখন রশি বেয়ে উঠে যায়। কার্টার আরও চালাক। সে বেছে নিয়েছে গিরগিটি। মালয়ের জঙ্গল থেকে ধরেছে ওগুলো। রানাগাটের কাছ দিয়ে সার্কাস পার্টি যাওয়ার সময় সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখার জন্যে খেয়েছিল ক্যারাবান। সেই সময় এক ফাঁকে সবার অলক্ষে একটা গিরগিটি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল কার্টার। কোমরে দড়ি বেঁধে ওটাকে ডুলে দিয়েছিল মেসায়। পাহাড়ে চড়তে ওস্তাদ মনিটর লিজার্ভ। পাথরের ঝাজে বা পাহাড়ের ফাটলে পা ঢুকিয়ে দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখার অস্বাভাবিক ক্ষমতা এই প্রাণীগুলোর, যত টানাটানিই করা হোক, সংহজে খুলে আনা যায় না। দড়িতে টান পড়তেই আঁকড়ে ধরেছিল গিরগিটিটা। নোঙরের মত আটকে গিয়েছিল পাহাড়ের গায়ে। দড়ি বেয়ে তখন উঠে গেছে কার্টার। একটা গিরগিটির ওপর এভাবে ভরসা করে মস্ত খুঁকি নিয়েছে সন্দেহ নই, কিন্তু টাকার জন্যে বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল সে।’

‘অবিশ্বাস্য!’ বিড়বিড় করল কিনি।

‘হ্যাঁ। তবে প্রমাণ করে দিতে পারি। হ্যানসনের কেবিনের জানালার নিচে যে ফাটলটা আছে, তার পাশে এখনও আছে দাগ। গিরগিটির বৃকের চাপে হয়েছে। শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছিল বলে গভীর হয়ে পড়েছে দাগটা। ফাটলের নিচের মাটিতে খুঁজলে জুতোর ছাপও পাওয়া যেতে পারে। গিরগিটিটা ঠিক কোন পথে উঠেছে, তার চিহ্নও থাকতে পারে।’ শেরিফের দিকে চেয়ে বললাম, ‘গিয়ে দেখে আসতে পারেন।’

চোখ বড় বড় হয়ে গেছে ডিকসির। ‘গিরগিটির কথা তোমার মাখায় ঢুকল কি করে! এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার!’

ঠিক প্রশ্ন নয়, প্রশংসা; নীরবে হাসলাম শুধু, জবাব দিলাম না।

‘এক সময় গোয়েন্দা হওয়ার শখ ছিল,’ বলল শেরিফ। ‘এখন বুঝতে পারছি, চেষ্টা করলেও হতে পারেনা না। এর জন্যে মগজটা খুব বেশি পরিষ্কার হওয়া

মৃত্যুর স্বাদ

৫১

দরকার। ভালই করেছি ওপথে না গিয়ে। বন্দুকবাজদের নিয়ে আছি, সে-ই ভাল।
'তোমার মত কাউবয় এছাড়া আর কি করবে!' মুখের ওপর বলে দিল কিনি।
বুঝলাম, লেগে যাবে এখন দুই বুড়ো। লাঙক। ডিকসিকে নিয়ে বেরিয়ে চলে
এলাম।

সন্ধ্যা নামছে। লাল পাহাড়ের চূড়ায় ছায়া। পশ্চিম দিগন্তে মেঘের রঙ মলিন
হয়ে এসেছে, জায়গায় জায়গায় কালো ছোঁপ। অপরূপ দৃশ্য।
হাঁটতে হাঁটতে উঠে এলাম পাহাড়ের চূড়ায়। ফিরে তাকালাম শহরের দিকে।
ডিকসিও দাঁড়িয়ে পড়ল। 'বিল, এখনও তোমার ঠোঁট ব্যথা করছে?'
'করছে, তবে তখনকার মত ব্যথা পাব না।'

www.boirboi.blogspot.com

দুশমন

লন্ডা, ঋজু-দেহী যুবক জিম বোম্যান। চওড়া কাঁধ। রোদে পোড়া মুখ। পাহাড়-
পর্বত-মরুভূমির সঙ্গে যেন রক্তের সম্পর্ক। কত বছর বয়সে রাইফেল-পিস্তল;
চালাতে শিখেছে মনে নেই।

ইয়া বড় দুই শিক-কাবারের সঙ্গে বড় এক প্লট সীমের বীচি খাওয়া শেষ
করেছে জিম। প্লটের কানার কাছে দু-চারটে লেগে আছে এখনও। একটা একটা
করে তুলে মুখে পুরল। পরিষ্কার করে ফেন্সল প্লট। তারপর হেলান দিল চেয়ারে।
বাড়ি থেকে হাজার মাইল দূরে ছোট্ট শহর টাকার, অপরিচিত লোকজন।

রেস্টুরেন্টের দরজা খোলার শব্দে মুখ তুলে তাকাল সে। বেঁটেখাটো, মোটা
এক লোক দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। তার দিকে চেয়েই চমকে উঠল লোকটা,
অশ্রুট শব্দ বেরোল মুখ থেকে। পরমুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল বাইরের অন্ধকারে।

আবাক হলো জিম। চোখ মিটমিট করে আরও এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল
দরজার দিকে। শাগ করে কফির কাপ টেনে নিল নিজের দিকে। কেটলি থেকে
চালতে শুরু করল কফি। এ-শহরে কেউ চেনে না তাকে, সে-ও কাউকে চেনে
না।

বাইরে ঘোড়ার খুরের শব্দ হলো। দ্রুত সরে যাচ্ছে। বিশ্বয়ের ভাবটা এখনও
কাটেনি জিমের। চিন্তিত ভঙ্গিতে কাগজ আর কাটা-পাতা ~~কেন~~ করে সিগারেট
বানাল। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে আবার হেলান দিল চেয়ারে। টেল্লাস থেকে
বেরিয়েছিল গরুর পাল নিয়ে। চলে গিয়েছিল উত্তর-পশ্চিমের এক বড় শহরে।
ওখান থেকে টাকারের দূরত্ব আড়াইশো মাইল। গরু বিক্রি করে পেয়েছে দশ
হাজার ডলার। কোমরের বেল্টের গোপন ভাঁজে লুকিয়ে রেখেছে বড় নোটগুলো।
কিছু খুচরো রেখেছে প্যান্টের পকেটে, খরচাপাতির জন্যে। ফিরে চলেছে
টেল্লাসে। লাভের টাকা ব্যাংকে রেখে দিয়ে বাকি টাকায় আবার গরু কিনবে।
খাবার ও রাতের আশয়ের জন্যে এসে উঠেছে এই ছোট্ট শহরে। ভোর হলেই চলে
যাবে।

আবার খুলে গেল দরজা। রেস্টুরেন্টে এসে ঢুকল একটা মেয়ে, বেশ লন্ডা।
জিমের দিকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াল। বড় বড় হয়ে গেছে চোখ। সতর্ক
দৃষ্টি। দ্রুত এগিয়ে এল টেবিলের কাছে। 'পাগল হয়ে গেছ!' ফিসফিস করে বলল

সে, 'বসে বসে খাচ্ছ এখানে! সারা শহরে টহল দিচ্ছে ড্যাগা গালুশের লোক, তোমার জন্যে, তোমার শহরে ঢোকার অপেক্ষাই করছে ওরা।'

হাসল জিম। 'ভুল করছেন, ম্যাডাম। আপনার মত সুন্দরী যার কথা ভেবে অস্থির হয়, সেই ভাগ্যবান মানুষটি আমি নই। আমি এখানে নতুন। মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে এসেছি।'

এক পা পিছিয়ে গেল মেয়েটা, যেন ভৃত দেখছে।

ঠিক এই সময় তৃতীয়বার খুলে গেল দরজা, এবার ঝটকা দিয়ে। ঘরে এসে ঢুকল একজন লোক। জিমের সমান লম্বা। তবে আরও হালকা-পাতলা। রাগে জ্বলছে কালো চোখের তারা। 'সরো বেলিন্দা, সরে যাও ওর সামনে থেকে! খুন করব আমি বুটাকাৎ!'

কোমরের রিভলভারের কাছে হাত চলে গেছে লোকটার।

বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন জিমের শরীরে। কাত হয়ে গেল একপাশে, মেঝেতে পড়ছে। সেই অবস্থায়ই হাতে বেরিয়ে এল রিভলভার।

গুলির শব্দ হলো একবার। লম্বা লোকটার রিভলভারের।

জিমও গুলি চালান, পর পর দু'বার।

হঠাৎ স্থির হয়ে গেল আগলুক। ঝটকা দিয়ে বাঁ হাতটা উঠে এসে বুক চেপে ধরল। বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা। শ্বাস টানার চেষ্টা করছে, পারছে না। অকেজো হয়ে গেছে ফুসফুস। ধীরে ধীরে সামনে ঝুঁকল মাথা, হাত থেকে খসে পড়ে গেল রিভলভার, মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে।

উঠে দাঁড়াল জিম। চেয়ে আছে পড়ে থাকা লোকটার দিকে। হঠাৎ ঘুরল মেয়েটার দিকে, প্রশ্নের তুবড়ি ছোটাল, 'কে লোকটা? কি ঘটছে এখানে? আমাকে কোন্ লোক বলে ভাবা হচ্ছে?'

'তুমি...তুমি...জিম স্যাবার নও?' গলা কাঁপছে মেয়েটার। চোখ বিস্ফারিত।

'স্যাবার?' মাথা নাড়াল জিম, 'না। আমি জিম, তবে স্যাবার নই, বোয়ামান। এর আগে কখনও আসিনি এ-শহরে।'

বাইরের রাস্তায় একাধিক লোকের ছুটন্ত পায়ের শব্দ হলো।

দুই লাফে আরও কাছে চলে এল বেলিন্দা। খপ করে চেপে ধরল জিমের হাত। 'জলদি, জলদি আসুন! আপনার কথা শোনার অপেক্ষা করবে না ওরা! দেখলেই গুলি চালাবে! সব-ক'টা খুনে ডাকাত, ড্যাগা গালুশের লোক!'

জিমের পাশাপাশি দৌড়াচ্ছে মেয়েটা। হোটেলে ঢুকে পড়ল। পেরোল একটা বড়সড় হলঘর: রেস্টুরেন্টের দরজা খুলে যখন হুড়মুড় করে ঢুকতে শুরু করছে ড্যাগার লোক, ওরা তখন বেরিয়ে পড়েছে পেছনের অন্ধকার গলিপথে।

বাঁয়ে সোভ নিল বেলিন্দা। পাশে জিম। হোটেলটা পেরিয়ে এসেছে। সামনে আরেকটা বাড়ি। ওটার পেছনে এসে দাঁড়াল। দরজা খোলা। জিমকে নিয়ে সোজা

ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। পাল্লা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিল। জোরে জোরে হাঁপাতে লাগল গাড় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে।

পাশের বাড়ির দরজার কাছে হাঁকডাক, শোরগোল শোনা যাচ্ছে। জোরে দরজার পাল্লা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ হলো একবার। রিভলভারটা এখনও হাতেই ধরা আছে জিমের। দ্রুতহাতে খুলে ফেলে দিল দুটো খালি খোশা, নতুন বুলেট ভরল চেয়ারে। ছয় গুলির ম্যাগাজিন। এমনিতে একটা গুলি কম করে ভরে রাখা সে, শিপ্রণ্ডের আয়ু বাড়ানোর জন্যে। এখন হ'টা পুরো করে রাখল।

'এ-বাড়িতে ঢুকবে না?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল জিম।

'না। এটা শেরিফের অফিস, জানাল বেলিন্দা।

'আপনি যে ঢুকলেন? কেআইনী হয়ে গেল না?'

'না। পাট-টাইম চাকরি করি আমি এখানে।' মেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা দরজার লাঠিটা তুলে জায়গা মত বসিয়ে দিল বেলিন্দা। 'দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। আসুন, বসে থাকুন। এখানে ঝুঁজতে আসবে না ওরা।'

অন্ধকারে হাত ধরে একটা টেবিলের কাছে জিমকে নিয়ে এল বেলিন্দা। চেয়ারে বসিয়ে দিল। আরেকটা চেয়ারে নিজে বসল।

জানালার কাছ থেকে দূরে রইল জিম। মেয়েটা বসেছে জানালার পাশে। আবছা আলোয় তার চেহারা অস্পষ্ট, শুধু আকৃতিটা চোখে পড়ছে। খুব সুন্দরী, রেস্টুরেন্টে লন্টনের আলোয় ভাল করেই দেখেছে সে। বড় বড় ফুস চোখ, বাষ্টির পানির মত উলটলে পরিষ্কার। চমৎকার ফিগার।

'কি ঘটছে এ-শহরে?' জিজ্ঞেস করল সে। 'আমাকে খুন করতে চাইল কেন লোকটা?'

'আপনাকে নয়, জিম স্যাবারকে। অবিকল আপনার মত দেখতে। যমজ ভাই বলা যায়!'

'সে এখন কোথায়? কেন খুন করতে চায় তাকে ওরা? যাকে মেরে রেখে এলাম, সে কে?'

চুপ করে রইল বেলিন্দা।

জিম বুঝল, মেয়েটা এখনও তাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সে যে জিম স্যাবার নয়, নিশ্চিত হতে পারছে না।

অবশেষে জবাব দিল বেলিন্দা, 'যাকে খুন করলেন, সে মরণাল কালফেন। খুন-খারাপিই ছিল পেশা। ড্যাগা গালুশের ভাড়টে গুণ্ডা। স্যাবার ওকে চোর, খুনে-বন্দাশ বলে গাল দিয়েছিল। সামনে নয় অবশ্যই, ড্যাগার সঙ্গে কথা বলার সময়। মরণাল একথা শুনে ভীষণ রাগে গিয়েছিল। ঘোষণা করে দিয়েছিল, স্যাবারকে দেখলে কুকুরের মত গুলি করে মারবে। এটা দিন চারেক আগের ঘটনা। এরপর থেকে আর স্যাবারকে দেখা যায়নি। শহরের সবাই ধরে নিয়েছে মরণালের ভয়ে পালিয়েছে সে। তবে এজন্যে কাপুরুষ ডাবছে না তাকে কেউ। মরণালের ভয়ে যে

মৃত্যুর স্বাদ

৫৫

কেউই পানাতে পারে।'

'আমি পানাভাম না।'

'সে তো নিজের চোখেই দেখলাম।'

'তাহলেই বুঝতে পারছেন, আমি স্যাবার নই,' অন্ধকারেই হাসল জিম, তার হাসিটা দেখতে পেল না বেলিন্দা। 'যাই হোক, ড্যাগা গালুশের সঙ্গে স্যাবারের শত্রুতাটা কি নিয়ে? গোলমাল তো নিশ্চয় একটা হয়েছে, নাকি?'

'এখান থেকে উত্তরে গ্ল্যাক রক পাহাড়ের ওপাশে, এলডার ক্রীক বলে একটা জায়গা আছে। তিন পাশে পাহাড়। উপত্যকায় বেশ বড়সড় একটা ভূগড়মি। টাকার আর এর আশপাশে শুকনো অঞ্চল, পানির বড় অভাব। কিন্তু এলডার ক্রীকে পানি আছে। পর্বতের গা বেয়ে বার্না নেমে চলে গেছে মরুভূমির দিকে। সব সময় পানি থাকে ওতে। তবে মরুভূমিতে বেশিদূর এগোতে পারে না, একজায়গায় গিয়ে শুকিয়ে মরে যায় বার্না। অনবরত চলছে এই অবস্থা। বার্না যেখান দিয়ে বইছে, সেখানে চমৎকার ঘাস জন্মায়। উপত্যকাটার মালিক ছিল...'

'জিম স্যাবার?'

'কি করে বুঝলেন?'

'অনুমান।'

'আপনার অনুমান ভুল। জায়গাটার মালিক ছিল এক বৃদ্ধ, বিল হার্ভে। দিন বিশেক আগে ঘোড়া থেকে পড়ে মারা গেছে। পাকা ঘোড়সওয়ার ছিল, ঘোড়া থেকে তার পড়ে মরাটা একেবারেই অস্বাভাবিক, অবিশ্বাস্য। যাই হোক, তার মৃত্যুর পর উইল খুলল উকিল। দেখা গেল, জায়গাটা ভাতিজা-ভাতিজিকে দিয়ে গেছে হার্ভে। নিউ ইয়র্কে থাকে দু-ভাইবোন। এখানে কোনদিনই আসবে না। জায়গাটা বিক্রি করে টাকাটা নিউ ইয়র্কে পাঠিয়ে দেবার অনুরোধ করে গেছে, দায়িত্বটা উকিলের ওপর। জায়গা কেনার ব্যাপারে দু-জন মানুষকে অগ্রাধিকার দিয়ে গেছে সে। প্রথমজন জিম স্যাবার। পরলা কিস্তিতে দশ হাজার ডলার দিতে হবে, তারপর ছ-বছরে শোধ করতে হবে বাকি চল্লিশ হাজার ডলার।'

'তারমানে, মিস্টার হার্ভে চেয়েছেন জায়গাটা স্যাবারই কিনে নিক? এ-জনেই প্রথম সুযোগ দেয়া হয়েছে?'

'হ্যাঁ। দ্বিতীয় সুযোগ আমার। আমরা দু-জনে কেউই যদি কিনতে না পারি, কিংবা কিনতে রাজি না হই, কেবল তখনই নিলামে উঠবে হার্ভে-র্যাঞ্চ। আর নিলাম হলে মালিক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি রাস্টি কানাহান কিংবা হোরউইক বেষ্টলির। প্রচুর টাকা ওদের। এখানে এত টাকা আর কারও নেই, নিলাম ডেকে ওদের দু-জনের সঙ্গে পারবে না কেউ।'

বাইরে কমে আসছে হই-চই। নির্জন হয়ে আসছে রাস্তা।

কান পেতে শুনল বেলিন্দা। 'মনে হয়, খোঁজাখুঁজি বন্ধ করে দিয়েছে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আংকেল হার্ভের খুব ইচ্ছে ছিল, র্যাঞ্চটা স্যাবারের হাতেই যাক। ওটার

ফোরম্যান ছিল সে, র্যাঞ্চের উন্নতির জন্যে অনেক কিছু করেছে, অনেক খেটেছে। হার্ভে-র্যাঞ্চ গড়ে ওঠার পেছনে অনেক অবদান রয়েছে তার। আমি অবশ্য র্যাঞ্চটার জন্যে কিছু করিনি, তবে ভালবাসতাম। আংকেলকেও বাসতাম। সে-ও আমাকে পছন্দ করত, ভালবাসত, অনেকটা মেয়ের মত। তাই আমাকে দ্বিতীয় সুযোগ দিয়ে গেছে। কিন্তু আমার টাকা নেই। ডাকাতগুলো জানে সেটা। আমাকে গোণায়ই ধরে না সে-জনে। কিন্তু জিমের কাছে কিছু টাকা ছিল। বাকিটা জোগাড় করতে পারত। ওর পেছনে লাগার হয়তো এটাই প্রধান কারণ। ওই ড্যাগা দস্যুটাই মরণানকে লেলিয়ে দিয়েছে জিমের পেছনে। খুন করতে পাঠিয়েছে। মরণানকে গালাগাল করেছে জিম, এটা একটা ছুতো, খুন করার বাহানা মাত্র, আর কিছু না।'

'এর মধ্যে ড্যাগার কি লাভ? সে-ও কিনতে চায়?'

'চায় তো বটেই। তারও টাকা আছে, তবে রাস্টি কিংবা বেষ্টলির ধারেকাছেও না। আমার বিশ্বাস, কোন ভাবে কায়দা করে র্যাঞ্চটা দখল করতে চায় সে। আপাতত রাস্টির সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছে। তবে শেষ পর্যন্ত কে যে কাকে ঠকিয়ে বসবে, কিছুই বলা যায় না।'

'বেটলি?'

'বেটলি নির্দোষ মানুষ। ভাল মানুষ। আর যাই করুক, অন্তত ঠকাঠকির মধ্যে যাবে না। হয়তো দেখা যাবে, শেষ পর্যন্ত কিনতেই রাজি হলো না র্যাঞ্চটা। আসলে, তার দরকারও নেই ওটার।'

'তার মানে জিম আর রাস্টিই এখন ড্যাগার পথের কাঁটা? বুড়ো হার্ভে তো মারাই গেছে...'

জিমের কাছে ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। এ-ধরনের ষড়যন্ত্র আরও হতে দেখেছে সে, যদিও নিজেকে সে সবে জড়ায়নি কখনও। এসব মরু অঞ্চলে পানির সাংখ্যাতিক অভাব, গরুমোষ যারা পালে, তাদের কাছে পানি সোনার চেয়েও দামী...

হঠাৎ জিমের হাত খামচে ধরল বেলিন্দা। বাইরে কথা শোনা যাচ্ছে।

'নাহ, ব্যাটা পালিয়েছে,' বলল একজন। 'বুড়ো বেন কসম খেয়ে বলছে, সঙ্গে শুধু বেলিন্দা ছিল, আর কেউ না। সামনা-সামনি মরণানকে গুলি করে মারবে মেয়েটা, এ ভাবাই যায় না। তারমানে জিমই গুলি করেছে। সেটাও আরেক অশুচর্য। সে এতবড় গানম্যান কোনদিন ছিল না!'

'ছিল তো না-ই। আর হঠাৎ করে হয়ে যাবে, সেটাও সম্ভব না,' বলল আরেকটা কষ্ট। এমন খসখসে গলা, মনে হয় শিরিষ কাগজ দিয়ে কাঠ ঘষা হচ্ছে। 'ও জিম স্যাবার নয়, রাস্টি! হতেই পারে না!'

জিমের কানে কানে বলল বেলিন্দা, 'ড্যাগা গালুশ!'

'কিন্তু বেন যে কসম খেল!' বলল রাস্টি, 'একবার কারও চেহারা দেখলে

ভোলে না বুড়ো...'

'ভুলুক আর না ভুলুক, আমি বলছি ও জিম স্যাবার নয়!' অর্ধেক শোনাল ড্যাগার কষ্ট। 'সে হলে মরণানকে দেখলেই প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলত, থাক তো গুলি করা...রিভলভার চালাতে জানে নাকি সে? দশবার গুলি করলে নয়বারই মিস...ওই লোক টেকা দেবে মরণানের সঙ্গে? অসম্ভব! আমি বিশ্বাস করি না।'

'তাহলে কে মারল মরণানকে?'

'মরেছে যখন, কেউ তো নিশ্চয় মেরেছে...মরণানকে ঢুকতে দেখেই গুলি করে বসেছে...'

'বুড়ো কিন্তু সে-কথা বলেনি। সে বলেছে, আগে গুলি চালিয়েছে মরণান। মিস করেছে। তারপর গুলি করেছে জিম। তাজ্জব হয়ে গেছে সে। ওরকম গানম্যান নাকি কমই দেখেছে...'

'লোকটা যে জিম স্যাবার নয়, আরও শিওর হলাম।'

'কিন্তু চেহারা...'

'জাহান্নামে যাক চেহারা!' সন্তোষজনক কোন জবাব দিতে না পেয়েই যেন রেগে গেল ড্যাগা। সামলে নিল সঙ্গে সঙ্গেই। কষ্টস্বর কিছুটা কোমল করে বলল, 'আর মাত্র তিন দিন বাকি। বেলিন্দা টাকা জোগাড় করতে পারবে না। জিম স্যাবারও আর ফিরবে না। অহেতুক ঝামেলা না করে আমাদের এখন উচিত চুপ করে বসে থাকা। ওরা টাকা জোগাড় করে আগে আসুক, তারপর দেখব কি করা যায়। কেনার সামর্থ্যই নেই যাদের, তাদের সঙ্গে শুধু শুধু লাগতে যাচ্ছি কেন আমরা?'

'তা-ও কথা ঠিক, কষ্ট শুনেই বোঝা গেল, নিশ্চিত হতে পারছে না রাস্টি।

বাইরে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল বুটের শব্দ।

চুপচাপ বসে আছে জিম। তারার আবছা আলো কাঁচের জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকছে। অন্ধকারও সয়ে এসেছে চোখে। বেলিন্দার চেহারা আবছামত দেখতে পাচ্ছে এখন সে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসেছে মেয়েটার। ছোট্ট অফিসের কোথায় কি আছে, তা-ও আবছাভাবে চোখে পড়ছে। একটা টেবিল, খানকয়েক চেয়ার, একটা ফাইল রাখার আলমারি। একপাশে বুক-ফেস, বইয়ে ঠাসা।

উঠে দাঁড়াল জিম। 'হোটেলের যেতে হবে আমাদের। জিনিসপত্র সব রয়ে গেছে, ঘোড়াটাও ওখানেই।'

'আপনি...আপনি চলে যাবেন?' জিমের চলে যাওয়াটাই যে স্বাভাবিক, যেন ভুলে গেছে বেলিন্দা।

অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল জিম। 'নিশ্চয়! এটা আরেকজনের লড়াই, আমার নয়। ইতিমধ্যেই একজনকে খুন করে বসে আছি। এখানে থাকলে আরও ক'জনকে করতে হবে, কে জানে। নিজেও হয়ে যেতে পারি...'

'একটা ব্যাপার খেয়াল করছেন?' জিমের কথাগুলোকে বেলিন্দা খুব একটা

গুরুত্ব দিল বলে মনে হলো না। 'জিম স্যাবার যে ফিরবে না, এ-ব্যাপারে ড্যাগা নিশ্চিত। কি করে হলো? আপনাকে না দেখেও বলে দিতে পারল, আপনি স্যাবার নন।'

ফ্রুটি করল জিম। 'করিনি, তা নয়। তবে মাথা ঘামাচ্ছি না। জিম ফিরে আসুক বা না আসুক, তাতে আমার কি?'

চুপ হয়ে গেল বেলিন্দা।

আবছা অন্ধকার অফিস ঘর। বেলিন্দার এই নীরবতায় অস্বস্তি বোধ করতে লাগল জিম। বুঝতে পারছে, বেশি রুক্ষ হয়ে গেছে তার কথাগুলো। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্যে জিজ্ঞেস করল, 'স্যাবার মারা গেলে আপনার অসুবিধে কি?'

'ভাই মারা গেলে বোনের যে অসুবিধে হয়।'

'স্যাবার আপনার ভাই!'

'মায়ের পেটের নয়। রক্তের সম্পর্কও ছিল না। কিন্তু ও আমাকে ছোট্ট বোনের মত ভালবাসত। সে ব্যাষ্টি কিনতে পারলে আমিও ওখানে ঠাঁই পেতাম। ও আমাকে সাহায্য করতই।'

'আপনজন কেউ নেই আপনার এখানে?'

'এখানে কেন, দুনিয়ার কোনখানেই নেই। আমি একেবারে একা,' থেমে গেল বেলিন্দা। 'কি বলছি! এসব কথা আপনি শুনে কি করবেন? আসলে ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ করে নির্ভরতা চলে এসেছিল আপনার ওপর...'

'অন্য কেউ স্যাক্সের মালিক হলে আপনার খুব অসুবিধে হবে?'

'আমার আর কি হবে? আমি যেমন আছি, থাকব। জিম হলে সুবিধে হত, এই আরকি। ক্ষতি যাদের হবে, তারা স্যাক্সের কর্মচারী। অনেক পুরানো লোক, বহুদিন ধরে আছে। একজনকেও রাখবে না রাস্টি। সবাইকে বিদেয় করে দিয়ে নিজের লোক ঢোকাবে। আমাদের তো পছন্দ করতই, ওদের মুখের দিকে চেয়েও জিম আর আমাকে স্যাক্সটার মালিক করতে চেয়েছিল আংকেল হার্ভে।'

'হুঁ, এক পা থেকে আরেক পায়ে শরীরের ভার বদল করল জিম, 'আপনার মনোকষ্টের কারণ বুঝতে পারছি। জিমের কথা ওরকম করে বলা উচিত হয়নি আমার। না জেনে দুঃখ দিয়ে ফেলেছি, সরি।'

দরজার কাছে পৌছে ফিরে তাকাল সে। 'ব্রেস্ট্রুট থেকে বের করে আনার জন্যে ধন্যবাদ।'

জবাব দিল না বেলিন্দা।

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল জিম। কান পেতে শুনল বাইরে শব্দ আছে কিনা। দরজা খুলে বেরিয়ে এল। আস্তে করে পেছনে ভিড়িয়ে দিল পাল্লা। সময় নষ্ট করতে চায় না। ভোরের আলো ফোটার আগেই চলে যেতে হবে শহর থেকে অনেক দূরে। আরেকজনের লড়াইয়ে নাক গলানো বন্ধিমানের কাজ নয়। তার কোনও

স্বার্থ নেই। কেন শুধু শুধু মরার ঝুঁকি নেবে? মেয়েটাকে সাহায্য করতে পারত, থেকে যাবার পক্ষে একটা কারণ হতে পারত সেটা। কিন্তু রায়স্ফের মালিকই হয়নি এখনও বেবিলন্দা, কিনে নেবার টাকাও নেই। তার সঙ্গে বিরোধ নেই কারও, কোনরকম বিপদে পড়েনি; কি সাহায্য করবে তাকে জিম?

দ্রুত, নিঃশব্দ পায়ে হোটেলের পেছনের দরজায় এসে দাঁড়াল সে। চট করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। নিরাপদেই এসে ঢুকল নিজের ঘরে। রাতের জন্যে ভাড়া নিয়েছিল ঘরটা। না, তার জিনিসপত্র কেউ ছোঁয়নি। যেটা যখনো যেভাবে রেখেছিল, সেভাবেই আছে। কেউটা তুলে নিয়ে জিনের সঙ্গে আটকানো ব্যাগে ভরল। তুলে নিল দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা রাইফেল। ব্যাগসুদ্ধ জিন কাঁধে তুলে নিয়ে রাইফেল হাতে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বেড়ালের মত নিঃশব্দে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। পেছনের দরজা দিয়েই বেরিয়ে এসে নামল আবার গলিপথে।

অন্ধকার, নীরব, নির্জন পথ। ড্যাগা গালুশ তার দলবল নিয়ে কোথায় গেছে, জানে না সে। কাউকে চোখে পড়ছে না কোথাও। কিন্তু মুহূর্তের জন্যে অসতর্ক হলো না। পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল আন্তাবলের দিকে, বাড়ির ছায়ায় গা ঢেকে।

চওড়া দরজা, ভেতরে আলো জ্বলছে। দাঁড়িয়ে পড়ল জিম। ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই। ঘোড়াটা রয়েছে আন্তাবলের ভেতর, ওটা বের করে আনতে হবে। দরজার পাশের অন্ধকার ছায়ায় দাঁড়িয়ে চারপাশে আরেকবার তীক্ষ্ণ নজর বোলাল সে, কাউকে চোখে পড়ল না। চট করে ঢুকে পড়ল আন্তাবলের খোলা দরজা দিয়ে।

বিশাল কালো একটা ঘোড়া। জিন পরতো মাত্র কয়েক মিনিট লাগল। লাগাম ধরে টেনে ঘোড়াটাকে নিয়ে চলে এল দরজার কাছে। ঘোড়ায় চড়তে যাবে, এই সময় জিজ্ঞেস করল একটা কণ্ঠ, 'চলে যাচ্ছ?'

রাগি কানাহানের গলা।

থমকে গেল জিম। ধীরে, অতি ধীরে জিন থেকে হাত সরিয়ে আনল। ফিরে তাকাল। একটা খড়ের গাদার ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসেছে লোকটা। এতক্ষণ লুকিয়ে ছিল ওখানে।

'কেন নয়?' মুখে হাসি ফোটাল জিম। 'অকারণ মানুষ খুন পছন্দ করি না আমি। তাছাড়া এখানকার লোকও নই। অহেতুক গণ্ডগোলে জড়াব কেন? আমার বাড়ি টেন্সাসে, সেখানেই ফিরে যাবি।'

মুদু হাসল রাগি। 'বুদ্ধিমান হলে সেটাই করা উচিত। তবে টাকা কামানোর সুযোগ ছাড়াটাও বোকার কাজ, যদি ক্ষমতা থাকে? পাঁচ হাজার ডলার দেব আমি তোমাকে, লগদ পাঁচ।'

পাঁচ হাজার! চোখ মিটমিট করল জিম। তার বেলেট এখন যা রয়েছে, তার অর্ধেক। দশ হাজার কামাতে অনেক সময় ব্যয় করতে হয়েছে তাকে, অনেক

পরিশ্রম করেছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গরুর পালসহ পাড়ি দিয়েছে হাজার মাইল অতি-দুর্গম পথ। রক্তপানি করা টাকা ওগুলো।

'শান্তকণ্ঠে বলল, 'পাঁচ হাজার অনেক টাকা। কেন দেবেন আমাকে?'

আবছা অন্ধকার থেকে আলোয় বেরিয়ে এল রাগি। কাছে এসে দাঁড়াল। চামড়ার রঙ দেখে মনে হয় মরচে-পড়া। রাগি অবশ্য তার নাম নয়, লোকে দিয়েছে, ওই মরচের মত রঙের কারণে। ওর নাম আসলে বিল কানাহান।

'কাজ তো অবশ্যই করতে হবে তোমাকে। শুধু শুধু কি আর টাকা দেয় কেউ। তবে তেমন কঠিন কিছু না,' বলল রাগি। 'তুমি যা আছ তাই থাকবে, জিম স্যাবার...'

'আমি স্যাবার নই।'

'জানি। সেটা এখানকার কাউকে বুঝতে দেবে না। জিম স্যাবার সঙ্গে থাকবে, এবং সে-জন্মেই টাকাটা দেয়া হবে তোমাকে। রায়স্ফটা আমি কিনে নেয়ার পর তোমার পারিশ্রমিক দিয়ে দেব। সেখানে খুশি চলে যোয়ো।'

ও, এই ব্যাপার। এখনই ড্যাগার সঙ্গে বেঙ্গমানী করার ফন্দি এঁটেছে রাগি! কৌশলে জিমকে দিয়ে রায়স্ফটা কিনিয়ে নেবে।

ধিধা করছে জিম। টাকা যেমন, ঝুঁকিও তেমন। রাগির পক্ষ নিলে সে ড্যাগার শত্রু হয়ে যাবে। ড্যাগা তখন গুণ্ডা লেলিয়ে দেবে তার পেছনে। খুন করাবে। রাগিকেও একবিন্দু বিশ্বাস নেই। পাঁচ হাজার আবার তাকে দেয়ার চেয়ে কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তার বুকে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দেয়ার জন্যে অন্য কাউকে খুব সামান্য কিছু দিয়ে দেবে। বাস, কাজও উজ্জ্বর হবে, টাকাও বাঁচবে।

জিমের চুপ করে থাকাটাকে সম্মতির লক্ষণ ধরে নিল রাগি। বলল, 'ভয় নেই, তোমাকে নুকিয়ে রাখা হবে। পাহাড়ের ওপর একটা কেরিন আছে আমার। চার-পাঁচজন লোকও আছে। গানম্যান হিসেবে খুব একটা খারাপ বলতে পারবে না ওদের। পাহারা দিয়ে রাখবে তোমাকে। সময় হলে বেরিয়ে আসবে তুমি। টাকা নিয়ে পকেটে ভরবে। কয়েকটা কাগজ সহই করে দিয়ে চলে যাবে নিজের পথে। খুব কি কঠিন কাজ?'

'না, বেশি সহজ, সে-জন্মেই ভাবছি। জিম স্যাবারের সহই ওরা মিলিয়ে দেখবে না?' দ্রুত চিন্তা চলছে জিমের মাথায়। টাকার জন্যে এতবড় একটা অন্যায্য করবে কিনা ভাবছে।

'জীবনে তিন-চারটের বেশি সহই কেরিন জিম স্যাবার,' হাসল রাগি। 'হাসিটাও কেমন যেন মরচে-পড়াই মনে হয়।' 'খোঁজ নিয়েছি, ওসব কাগজপত্রেরও কোন চিহ্ন নেই।'

একজন বৃদ্ধ, সং মানুষের আজীবন পরিশ্রমের ফসল ওই হার্ভে-রায়স্ফ। কয়েকজন অর্থলিপ্সু ডাকাতে ওটা নিয়ে ছিন্মিন্মি খেঁবে ভাবতেই রাগ হতে লাগল জিমের। স্যাবারকে খুন করেছে ড্যাগা, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। বৃদ্ধ

হার্ভের ঘোড়া থেকে পড়ে মরাটাও হয়তো দুর্ঘটনা নয়—খুন। দুর্ঘটনার মত করে সাজানো হয়েছে। বেলিন্দার কথাগুলো কানে বাজতে লাগল: আপনি চলে যাবেন!...জিম আমাকে ছোটবোনের মত ভালবাসত, সে রাক্ষসটা পেলে আমিও ওখানে ঠাই পেতাম...পুরানো কর্মচারী সব বিদেয় করে নতুন লোক রাখবে রাস্টি...

কি করবে, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না জিম। ইচ্ছের বিরুদ্ধেও মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'চলুন, কোথায় যেতে হবে?'

বার্টলেট পিকের উত্তর ঢালে চূড়ার কাছাকাছি তৈরি করা হয়েছে কেবিনটা। চারপাশে ধোপঝাড় আর পাখরের টিলার জন্যে পাহাড়ের গোড়ায় দাঁড়িয়ে চোখে পড়ে না ওটা। এখানেই জিমকে রেখে গেল রাস্টি কানাহান। নিজের চারজন লোক রেখে গেল পাহারায়। দু-জন রইল কেবিনের সামনের ছোট চত্বরে। অন্য দু-জন নিচে, শহরের দিক থেকে আসা পাহাড়ে চড়ার পথের ওপর। ওদের চোখ এড়িয়ে কেউ ঢুকতে পারবে না কেবিনে।

রাত কাটল। পরের সারাটা দিন কেবিন আর বাইরের চত্বরে শুয়ে-বসে কাটাল জিম। একের পর এক সিগারেট ধ্বংস করল, গল্প করল দুই পাহারাদারের সঙ্গে।

একজনের নাম টম মর্সি, বিগ টম বলে ডাকে সবাই। প্রায় সাত ফুট লম্বা বিশাল এক দানব। ফোলা গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সব সময় মেজাজ খারাপ থাকে। কথা বলে কম। হুঁ-হুঁ আর ঘোঁৎ-ঘোঁৎ দিয়ে বেশির ভাগ প্রশ্নের জবাব সারে। দ্বিতীয় লোকটা ঠিক তার উল্টো। নাম, কিপ লিনটন। বেঁটেখাটো শরীর, বিশাল বৃক্কের ছাতি, অনেকটা মঙ্গোলিয়ান ছাঁদের চ্যাপ্টা মুখ। হাসি লেগেই আছে ঠোঁটে। বকর বকরও করতে পারে প্রচুর।

এখানে থাকলে তার ভাগ্যে কি ঘটবে নিশ্চিত হয়ে গেছে জিম। টাকা তাকে ঠিকই দেবে রাস্টি, তবে সে-টাকা নিয়ে বেরিয়ে যেতে দেবে না। শহর থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে খুন করার চেষ্টা করবে। সেটা করতে পারলে যার টাকা আবার তার পকেটেই ফিরে যাবে।

তবে রাস্টিকে পরোয়া করে না জিম। কচি খোঁচা নয় সে। এমন বিপদে এর আগেও পড়েছে, বেরিয়ে এসেছে নিজের ক্ষমতায়। যত ভয়ঙ্কর বিপদই আসুক, রুখে দাঁড়ানোর সাহস তার আছে।

থেকে থেকেই বেলিন্দার কথা মনে আসছে। রাতের অন্ধকারে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল দু-জনে। বাহুতে নরম হাতের হেঁয়ালি লেগে আছে যেন এখনও। কানে বাজছে চাপা নিঃশ্বাসের শব্দ। ধূসর বড় বড় চোখ। মেয়েটা সত্যি সুন্দরী।

একটা ইচ্ছে লুকোচুরি খেলছে মনের কোণে। শেকড় গাড়ার আগেই খেলাটা বন্ধ করতে চাইছে সে, পারছে না। ভাবনাটা হার্ভে-রাক্ষস ও বেলিন্দাকে নিয়ে।

স্বাভাব মৃত। রাক্ষসটা কেনার সামর্থ্য যে তিনজনের আছে তারা হলো বেন্টলি, রাস্টি, এবং ড্যাগা গালুশ। প্রথমজনের দেখা এখনও পাওয়া যায়নি, অবতীর্ণ হয়নি বঙ্গমঞ্চে। কাজেই তাকে রাক্ষসের ব্যাপার থেকে আপাতত বাদ রেখে দেয়া যায়। নিজেরা নিজেরা মারামারি করে মরবে বাকি দু-জনের অন্তত যে কোন একজন। দু-জনও যেতে পারে, কিন্তু ধরা যাক একজন বাঁচল। যে বাঁচবে, তার হাত থেকে রাক্ষসটা আনায় করতে হলে লড়তে হবে বেলিন্দাকে।

হার্ভে-রাক্ষসের যারা বর্তমান কর্মচারী, দীর্ঘদিন ধরে ওখানে কাজ করছে তারা। প্রায় সবাই পুরানো। এই মুহূর্তে ওদের কাজ চলে যাওয়ার মানে নিশ্চিত একটা ঠাই থেকে অকস্মাত বঞ্চিত হওয়া। হঠাৎ করে যাবে কোথায় ওরা? কি করবে? সাংঘাতিক বেকায়দায় পড়ে যাবে। এই এলাকায় কাজের বড় অভাব। চট করে আরেকটা জোগাড় করা কঠিন, আর তা করতে না পারলে না খেয়ে মরতে হবে। এটা ঘটতে দেয়া যায় না। কারও ক্ষমতা থাকলে এই অন্যান্য তার ঠেকানো উচিত।

কেবিনে আরেকটা রাত কাটাল জিম। পরদিন সকালে, নাস্তার পর ঘোড়াটা নিয়ে বেরোবে ঠিক করল। 'বাইরে বেরোতেই চোখ তুলে ডাকাল বিগ টম, 'কোথায় যাচ্ছে?' 'ঘুরতে,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল জিম। 'ভেব না, শিগগিরই ফিরে আসব।' দাঁত দিয়ে একটা ঘাসের ডগা কাটছে টম। 'কোথায় যাওয়া হবে না তোমার। বস বলে গেছে, চোখে চোখে রাখতে।'

হাত থেকে জিনটা ছেড়ে দিল জিম। 'বসে থাকতে আর ভাল্লাগছে না, বুঝলে। একটু ঘুরে আসি, দেখে আসি দেশটা।' 'হবে না,' ঘাসের ডগার শেষ টুকরোটা থুং করে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল টম। বিশাল থাবা তুলে কেবিনটা দেখাল, 'বসের নির্দেশ, কেবিনে থাকতে হবে তোমাকে। যাও, লক্ষী ছেলের মত চূপচাপ শুয়ে থাকাকোপে।'

'রাস্টি তোমার বসু, আমায় নয়। আমি তার নির্দেশ মানতে যাব কেন?'

'কারণ আমি তোমাকে মানতে বলছি।'

নিচু হয়ে জিনটা তোলার ভঙ্গি করল জিম। চোখের কোণ দিয়ে দেখছে, এগিয়ে আসছে টমের বিশাল বুটজোড়া। তুলেই টমের পা সই করে ধাঁ করে ছুঁড়ে মারল জিনটা। লাগল গিয়ে হাঁটুর সামান্য নিচে। তৈরি ছিল না টম। ভারসাম্য হারাল। পাটি থেকে সরে গেল পা। তাল সামলানোর ব্যর্থ চেষ্টা করল একটা মুহূর্ত। পারল না। পড়ে গেল উপড় হয়ে।

পড়েই উঠতে গেল আবার। বিন্দুং খেল গেল যেন জিমের শরীরে। দুই লাফে পৌছে গেল কাছে। আঙুল সোজা রেখে দা দিয়ে কোপানোর মত করে রন্দা মারল টমের ঘাড়ে। ভয়ানক আঘাত। টমের মত দানবও সহ্য করতে পারল না। আবার পড়ল মুখ খুবড়ে।

চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে আবার উঠল টম। তাকে দাঁড়ানোর সুযোগ দিল জিম। কিন্তু আঘাত করার সময় দিল না। যাড়ে যে-ভাবে মেরেছে তেমনি করেই মারল পেটের মাঝামাঝি।

উঁক করে একটা শব্দ বেরোল দানবের মুখ থেকে। সামনে বাঁকা হয়ে গেল শরীর।

ঘুসি চালাল জিম। পরপর দু-বার।

টমের মনে হলো, মাথার দু-পাশে মৃগের বড়ি পড়ল। মাথা ঝাড়া দিয়ে আবার সোজা হতে না হতেই এলোপাতাড়ি কয়েকটা মারাত্মক ঘুসি এসে পড়ল নাকে-মুখে।

চোখের পলকে চেহারার পাল্টে গেল তার। নাক বসে গেছে, নিচের চোঁট আধ ইঞ্চি কাটা, সামনের একটা দাঁত অদৃশ্য। টলে উঠল কাটা কলাপাছের মত। দড়াম করে আছড়ে পড়ল। মাথার একপাশে বুটের জোর এক ঠোকর খেয়ে জ্ঞান হারাল নীরবে।

গায়ের জোরে মেরেছে জিম। ব্যথা পেয়েছে হাতে। আঙুল টানতে টানতে ফিরল কিপের দিকে।

দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে চূপচাপ সিগার টানছে কিপ লিনটন। চোখে বিস্ময়। জিম তাকাতেই হাসল।

'তোমার ওপর বসের কোন নির্দেশ আছে?' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল জিম। 'থাকলেই কি?' বড়ো আঙুল দিয়ে টমকে দেখাল কিপ, 'আমি কি এটার মত গাধা? অত প্রভুভক্ত আমি নই। তোমার যেকোনো ইচ্ছে যাও।'

পাহাড় থেকে নেমে এল জিম। সৰু একটা পায়ে চলা পথ ঐক্যবৈকে এগিয়ে গেছে উত্তরে। সে-পথ ধরেই চলল। তেল চকচকে শরীর তার ঘোড়াটার। হাঁটার তালে তালে শক্তি যেন ফেটে পড়ছে পেশী থেকে।

মাইল দুয়েক গিয়ে ঘোড়ার মুখ ঘোরাল জিম। সামনে একটা উপত্যকা। সবুজ ঘাস। একপাশে পাহাড়শ্রেণী।

পথ থেকে ঘোড়া নামাল সে। তৃণভূমির ওপর দিয়ে ছোটাল।

ঘাসে ঢাকা ছোট জমিটুকু পেরিয়ে এল দ্রুত। আবার মোড় নিল ঘোড়া। পাহাড় এখন পেছনে, সামনে ঢাল হয়ে নেমে গেছে উপত্যকা। বিস্তীর্ণ তৃণভূমির ঠিক মাঝ বরাবর কেটে দু-ভাগ করে দিয়ে বইছে ঝর্না, যেন চওড়া একটা রূপালি ফিতে। তৃণভূমির এক প্রান্ত থেকে আবার উঠে গেছে পাহাড়। ঢালের গায়ে জম্বে আছে গাছপালা, রোপসঝাড়। তার ভেতরে দেখা যাচ্ছে ঘরের চাল।

ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল জিম। সিগারেট ধরাল। বুক ভরে ধোঁয়া টেনে নিয়ে নাক-মুখ দিয়ে ছাড়তে ছাড়তে তাকিয়ে দেখল সামনের দৃশ্য। একটানা মাইল দশেক তৃণভূমি। মরুভূমির দিকের প্রান্ত শুকনো লাগছে এখন, তবে পর্বতের গোড়ায় যেকোনো পানি রয়েছে, সেখানে ঘাস বেশ ভাল। বসন্তের শুরুতে আরও

তাজা, আরও সবুজ, রসাল হয়ে উঠবে। গরু-মোষের জন্যে সত্যি খুব চমৎকার চারণভূমি।

জিম নিজে পশুপালক, কোথায় কোন ঘাস আর ঝোপ গরু মোষের প্রিয়, ভাল করেই জানে। জায়গাটা পছন্দ হয়ে গেল তার। উত্তর পশ্চিমে অনেক দূরে পর্বতের গায়ে একটা চওড়া কালো ফাটল, নিশ্চয় গিরিপথ। ওখানেও সবুজের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। বন রয়েছে, তারমানে শিকারও মিলবে ওখানে।

ভাল জায়গা পছন্দ করেছিল বুড়ো বিল হার্ভে।

আবার ঘোড়া চালান জিম। বড়সড় একটা পুকুরের পাড়ে এসে দাঁড়াল। পর্বতের গা থেকে নেমে আসা ঝর্নার গতিপথে খোঁড়া হয়েছে ওই পুকুর। পানি সব সময় ধরে রাখার জন্যে। পরিশ্রম কম করেনি হার্ভে। বুদ্ধিও ছিল লোকটার।

বোঝা যাচ্ছে, আন্তরিকভাবে খেটেছে হার্ভে-র্যাঙ্কের প্রতিটি লোক। স্যাবারেরও প্রচুর ঘাম ঝরেছে ওই তৃণভূমিতে। খামারটার আরও অনেক উন্নতি করতে পারত সে। ইচ্ছে করলে জিমও পারে, যদি মালিক হয় জায়গাটার। বেলিন্দা গ্যাটলিন পাশে থাকলে তো কথাই নেই।

সারটা সকাল ঘুরে বেড়াল জিম। ঘুরে ঘুরে দেখল র্যাঙ্ক ও তার আশপাশের অঞ্চল। তবে খামারবাড়ির বেশি কাছাকাছি গেল না।

দুপুর পেরোল। বিকেল হয়ে এল। এই সময় দেখল পাহাড়ের ওপাশ থেকে বেরিয়ে আসছে একদল ঘোড়সওয়ার। সে-ও গুদিক থেকেই এসেছে। র্যাঙ্ক হাউসের দিকে চলেছে ওরা। তাড়াতাড়ি কয়েকটা বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল জিম। উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল ঘোড়সওয়ারদের।

বেশি তাড়াছড়ো করছে যেন লোকগুলো। বিশেষ কোন ঘটনা না ঘটলে এমন করে না এমন। নিশ্চয় কিছু একটা করে এসেছে।

লোকগুলো চল গেলে পাথরের আড়াল থেকে বেরোল সে। ফিরে চলল রাস্তির কেবিনে।

পাহাড়ের পাশ দিয়ে মোড় নিয়ে এগিয়ে গেছে পথ। পেছনের অপরূপ দৃশ্যের দিকে আরেকবার ফিরে তাকাল জিম। তারপর গতি বাড়াল ঘোড়ার।

মোড় নিয়ে, খানিকটা খোলা জায়গা পেরিয়ে, আরেকটা পাহাড়ের গোড়ায় এসে পড়ল সে। কেবিনে যাওয়ার পথটা ঢাল বেয়ে উঠে গেছে, সেটা ধরে উঠতে শুরু করল।

ভাবতে ভাবতে চলেছে বলেই হয়তো পথের ওপর পড়ে থাকা লোকটাকে প্রথমে দেখতে পায়নি। ঘোড়াটা তীব্র ডাক ছেড়ে থমকে দাঁড়াতে চোখ পড়ল সামনের দিকে। তখনই দেখল, মরে পড়ে আছে লোকটা। রক্তাক্ত, খেঁতলানো দেহ। রাস্তি কানাহানের প্রহরী ছিল। পেটে গুলি করা হয়েছে। তারপর তার দেহ মাড়িয়ে দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে চলে গেছে খুঁচী।

একশজরই বোঝা গেল, মারা গেছে লোকটা। একটানে কোমরের খাপ

থেকে রিভলভার বের করল জিম। ভীষণ সতর্ক হয়ে গেছে। টান টান হয়ে উঠেছে শ্বাস।

পথের ওপর ঘোড়সওয়ার যাওয়ার চিহ্ন দেখতে পেল। অস্ত্রত বায়োটা ঘোড়া গেছে ও-পথ দিয়ে।

গাছের পাতায় শিশ কেটে যাচ্ছে বাতাস। দূর থেকে ভেসে এল ঈগলের ডাক। আর কোন শব্দ নেই। পুরোপুরি নীরব।

কেবিনের কাছে উঠে এল জিম। আরেকজন লোক মরে পড়ে আছে আঙিনায়। না, বিগ টম নয়। পাহাড়ের গোড়ায় প্রহরারত দু-জনের একজন। নিশ্চয় তাড়া খেয়ে পিছিয়ে এসেছিল এখানে।

লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নামল জিম। হাতে উদ্যত রিভলভার। তীক্ষ্ণ চোখে দেখল একবার আশপাশটা। কাউকে চোখে পড়ল না। কোন শব্দ নেই। দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ থাকা দিয়ে খুলে ফেলল পান্না। কেউ নেই ভেতরে। ভেঙেচুরে তছনছ করে ফেলা হয়েছে সমস্ত জিনিসপত্র।

থুরে ঢুকল সে। ভাঙা খাটের তলায় রয়েছে তার জিনিসগুলো। ঠিকই আছে সব। ছোঁয়ানি কেউ। তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

জিনিসগুলো চাপাল ঘোড়ার পিঠে। পরীক্ষা করে দেখল উইনচেস্টারের চেয়ার। বুলেট ভরা আছে, স্প্রিঙও ঠিকমত কাজ করছে। আবার ঘোড়ায় চরতে যাবে, এই সময় কানে এল চাপা গোঙানি।

পাই করে ঘুরল জিম। ডুর কুঁকে তাকিয়ে রইল। আবার এল আওয়াজ। সেই সঙ্গে সামনে ঝোপের ভেতর মৃদু নড়াচড়া।

ঝোপের পেছনে পাহাড়ি মেহগনির ছোট্ট জঙ্গল। পা টিপে টিপে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল সে। বেশ খানিকটা ঘুরে ঝোপের পেছনে এসে দাঁড়াল।

ভেতরে পড়ে আছে কিপ লিনটন। ক্যানাসে চেহারা, রঙে লাল শার্ট। শব্দ শুনে চোখ মেলে তাকাল। কোনমতে শুধু বলল, 'ড্যাগার লোক...'

কিপের পাশে এসে হাঁটু গেড়ে বসল জিম। আলতো হাতে খুলে দিল শার্টের বোতাম। বুকের বা পাশে গুলি লেগেছে। রক্তক্ষরণ হয়েছে প্রচুর। তবু বাঁচার ক্ষীণ সম্ভাবনা রয়েছে এখনও।

দ্রুত হাত চালান সে। আঙন জেলে পানি গরম করল। কিপের ক্ষতস্থান ভাল করে ধুয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল।

থমে থেমে জানাল কিপ, ড্যাগার লোকেরা জেনে গেছে, জিমকে এখানে এনে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তাকে খুঁজতেই এসেছিল। যাকে সামনে পেয়েছে তাকেই গুলি করেছে। টাকা খেয়ে বেইমশানী করেছে টম, জিমের কথা বলে দিয়েছে ড্যাগাকে।

কিপের ধারণা, রাস্টিকেও ছাড়বে না ড্যাগা; খুন করবে। হয়তো এতক্ষণে করে ফেলেছে। এমন করে সাজাবে কেসটা, মনে হবে রাস্টিই তাকে আক্রমণ

করেছিল, আত্মরক্ষার জন্যে বাধ্য হয়ে গুলি করতে হয়েছে ড্যাগাকে।

রাস্টির ওপর ড্যাগার এখনই রেগে যাওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। কথা ছিল, দু-জন মিলে রায়ফটা দখল করবে। কিন্তু জিমকে দেখে সে-সব চুক্তি ভুলে গিয়ে একাই মালিক হওয়ার ফন্দি আঁটল রাস্টি। সেটা সহ্য করবে কেন ড্যাগা?

মরুকগে, ভাবল জিম, তার কি? রাস্টি মরলেও তার কিছু না, ড্যাগা মরলেও না। বরং মরলে শত্রুর সংখ্যা কমবে। জিজ্ঞেস করল, 'মুখোমুখি হলে কে জিতবে?'

হাসল কিপ। 'অবশ্যই ড্যাগা। রাস্টির নিশানা তার চেয়ে ভাল। কিন্তু সে অস্থির স্বভাবের। আর ভাগা পাই হলে বরফের মত শীতল... তবে, ড্যাগা একা মুখোমুখি হতে যাবে বলে মনে হয় না। কোন ঝুঁকিই নেবে না সে। দলবল নিয়ে ঘেরাও করবে রাস্টিকে। কুকুরের মত গুলি করে মারবে। এমনও হতে পারে, নিজে সামনেই যাবে না। ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে কাজ সারাবে।'

কিপের পাশে কিছু খাবার আর এক ক্যানটিন পানি রেখে দিল জিম। দুটো কফল এনে রাখল। তারপর এসে চড়ল ঘোড়ায়।

পথ খোলা। ইচ্ছে করলে এখন টেক্সাসে রওনা হয়ে যেতে পারে সে। কিন্তু মনস্থির করতে পারল না। ঘোড়া চালান একদিকে। একসময় অনেকটা অবাধ হয়েই দেখল, টেক্সাস নয়, হার্ভে-রায়ফের দিকে চলেছে সে।

কতটা ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে, বুঝতে পারছে। কাছাকাছি ড্যাগার লোক থাকতে পারে। চোখ রাখতে পারে রায়ফের ওপর। সে যে বেঁচে আছে এটা জানতে দেরি হবে না। তার বেঁচে থাকাটা ড্যাগার জন্যে খুবই বিপজ্জনক।

স্বাভাবর সজ্জে হার্ভে-রায়ফ দখলে রাস্টিকে সহায়তা করতে যাচ্ছিল জিম, এটা বুঝে যাওয়ার পর ড্যাগা উঠে-পড়ে লাগবে তার পেছনে। খুন করার জন্যে পাগল কুণ্ডা হয়ে যাবে।

সতর্ক রইল জিম, খুব সতর্ক। সাবধানে পথ চলল।

রায়ফে পৌঁছল সূর্য ডোবার পর। গাছপালার আড়ালে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল খামারবাড়িটার দিকে। কয়েকজন লোক দেখা যাচ্ছে, কাজ করছে সবাই। তবে ওদের অস্থিরতা দেখেই বোঝা যায় মন বসাতে পারছে না কাজে। এভাবে অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পারার কথাও নয়। শেষ অবধি কি ঘটে, দেখার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে ওরা।

বাদামী একটা ঘোড়া বেরিয়ে এল খামারবাড়ি থেকে। পিঠে সওয়ারী। শহরের দিকে চলেছে বোধহয়।

পশ্চিম আকাশে রঙের খেলা। গোখুলির আলোয় দূর থেকে চেনা গেল না সওয়ারীকে।

কাছে চলে এল ঘোড়া। চিনতে আর অসুবিধে হলো না। বেলিন্দা গ্যাটলিন। দ্বিধা করল না জিম। পেছনে ছুটল। ঢাল বেয়ে নেমে ধরে ফেলতে সময়

লাগবে না।

জিমকে দেখে চোখ বড় বড় হয়ে গেল বেলিন্দার। 'আপনি! আমি তো ভেবেছিলাম এতক্ষণে বহুদূরে চলে গেছেন। গরুখোজা খুঁজছে ওরা আপনাকে।'

'ড্যাগার লোক?'

'না। তবে সে-ও লোক লাগিয়েছে। আপনাকে এখনও খুঁজে পেল না কেন সেটাই আশ্চর্য। শেরিফকে উদ্দেশ্য দিয়েছে সে। বুঝিয়েছে, রাস্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্যাবারকে খুন করেছেন আপনি। হার্ভে-র্যাফের লোভে।'

'তাই?' বেলিন্দাও একথাই বিশ্বাস করে কিনা বোঝার জন্যে তার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল জিম, কিছু বুঝল না।

মাথা ঝাঁকাল বেলিন্দা। 'বোঝানো হয়েছে, এ-শহরে হঠাৎ করে এসে পড়েননি আপনি। কোনভাবে অন্য কোথাও আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল রাস্তির। জিম স্যাবারের মত দেখতে বলে অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে আপনাকে স্যাবার সাজার প্রস্তাব দিয়েছে সে। কথামত যথাসময়ে এসে আপনি হাজির হয়েছেন টাকার। এসেই খুন করেছেন ড্যাগার লোককে।' জিমের চোখে চোখে তাকাল সে। 'সব কেমন খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে না?'

'তা যাচ্ছে,' জিমের কণ্ঠে অস্বস্তি। 'তবে একটা কথা বিশ্বাস করতে পারেন, জিম স্যাবারের নাম আপনার মুখেই প্রথম শুনেছি। রাস্তির সঙ্গেও পরিচয় হয়েছে এখানে এসেই। কোন কুমতলব নিয়ে আসিনি আমি এখানে। এসেছিলাম রাত কাটাতে, পরদিন সকালে উঠেই চলে যেতাম। কিন্তু আমার চেহারাটাই কাল হলো।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে জিমের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল বেলিন্দা। শান্তকণ্ঠে বলল, 'আপনি এখন থেকে চলে যান, এক্ষুণি। সমস্ত এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে ওরা। শেরিফের হাতে পড়লে তো ড্যাগা ভাব, জেলে যাবেন। কিন্তু ড্যাগার লোকের সামনে পড়লে রক্ষা নেই, গুলি করে মারবে।'

'রাস্তি কোথায়?'

আবার জিমের চোখে চোখে তাকাল বেলিন্দা। 'আপনার তো জানার কথা। অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে খুন হয়েছে সে।'

খবরটা জিমকে বিশেষ নাড়া দিল বলে মনে হলো না। 'এই দোষটাও নিশ্চয় আমার ঘাড়েই চাপানো হয়েছে?'

'হলে খুব একটা অবাধ হওয়ার কিছু আছে কি?'

'আছে। কারণ খুনটা আমি করিনি। এর জন্যে ড্যাগা দায়ী। হয় সে নিজের হাতে করেছে, কিংবা কাউকে দিয়ে করিয়েছে। আমাকে যেখানে আটকে রেখেছিল রাস্তি, সেই জায়গাটা তখনই করে দিয়ে এসেছে ড্যাগার লোক। যাকে সামনে পেয়েছে নির্বিচারে গুলি করেছে। মারতে গিয়েছিল আসলে আমাকে। পায়নি বলে

মৃত্যুর স্বাদ

বেঁচে গেছি।'

'আপনি এখন থেকে চলে যান,' আবার বলল বেলিন্দা।

ধীরেদুস্থে সিগারেট বানাতে লাগল জিম। চুপচাপ তার দিকে তাকিয়ে আছে বেলিন্দা।

অবশেষে মুখ তুলে তাকাল জিম। 'ম্যাডাম, আমি এসেছিলাম শান্তিতে রাত কাটিয়ে ডোরের উঠে চলে যেতে। আমাকে সেটা করতে দেয়া হয়নি। ঘাড়ে চাপল ড্যাগা। ওর মত একটা তৃতীয় শ্রেণীর গুণ্ডার ভয়ে লেজ গুটিয়ে পালানো কি আমার উচিত, আপনার কি মনে হয়? তাছাড়া এখন পালানে সবাই ভাববে, খুনগুলো আমিই করেছি।' খস করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে সিগারেটে আঙুন ধরাল সে। একগাল ধোঁয়া ছেড়ে জিজ্ঞেস করল, 'ভাল কথা, স্যাক্ষটা পাওয়ার কোন ব্যবস্থা করতে পেরেছেন?'

'কি করে? টাকাই নেই।'

'ধরুন,' সিগারেটের ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে আছে জিম, 'যদি কোন বন্ধু...কোন পার্টনার প্রথম কিস্তির টাকাটা দেয়? দশ হাজার ডলার...'

'অসম্ভব।' জোরে জোরে মাথা নাড়ল বেলিন্দা, 'এখানে তেমন কোন বন্ধু নেই আমার। দশটা ডলারও কেউ দেবে না...'

'আমার কাছে আছে দশ হাজার ডলার।'

চুপচাপ কয়েকবার সিগারেটে টান দিল জিম। হাঁ করে তাকে দেখতে বেলিন্দা। চোখে সন্দেহ। এরকম পুরানো, ময়লা বেশভূষার একজন মানুষের কাছে সত্যি এত টাকা আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করছে।

'বিশ্বাস করতে পারছেন না তো?' হাসল জিম, 'সত্যি আছে। এই গোলমালে আমি ইচ্ছে করে চুকিনি, কতগুলো শয়তান লোক জোর করে চুকিয়েছে। বাধ্য করেছে টুকতে। এখন এর শেষ না দেখে আমি ছাড়ব না। চলুন শহরে যাই। উকিলের সঙ্গে দেখা করে কাগজপত্র ঠিক করতে বলব আপনার নামে। কি বলেন?'

'টাকাটা সংপথে উপার্জন করা?'

আবার হাসল জিম, 'রাস্তির কাছ থেকে নিয়েছি ভাবছেন?'

'না...মানে...'

'অত ভাবনার কিছু নেই, ম্যাডাম। এর প্রতিটি পয়সায় ঘাম লেগে আছে আমার গায়ের, রক্তপানি করা টাকা। কয়েকজনে মিলে মন্টানায় গরু নিয়ে গিয়েছিলাম। বিক্রি করে যা পেয়েছি তাতে আমার ভাগে পড়েছে দশ হাজার। চলুন, যাই।'

'এত তাড়া কিসের!' বলে উঠল একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠ। 'রুডি, মেয়েটাকে ধরো।' কে কথা বলল, দেখারও প্রয়োজন মনে করল না জিম। জুতোর গোড়ালি দিয়ে ঘোড়ার পেটে গুঁতো লাগাল। চটাস করে চাটি মারল বেলিন্দার ঘোড়ার

মৃত্যুর স্বাদ

পেছনে।

স্প্রিংয়ের মত লাক্ষিয়ে উঠল দুটো ঘোড়া। তীর গতিতে ছুটল। পেছনে গর্জ উঠল রাইফেল। জিমের প্রায় কান ছুঁয়ে শিশ কেটে বেরিয়ে গেল বুলেট।

'থামবেন না, খবরদার!' চিচিয়ে উঠল জিম, 'চালিয়ে যান!'

এক ছুটে উপত্যকায় নেমে এল দুটো ঘোড়া। অন্ধকার হয়ে গেছে। আবহামত চোখে পড়ছে, আরেকটা সুরু পথ বেরিয়ে চলে গেছে বায়ে। বাদামী ঘোড়াটার লাগামের একপাশ ধরে টান দিল জিম, মাথা হেলিয়ে ইঙ্গিত করল। অন্ধকারে ইঙ্গিতটা দেখতে পেল না বেলিন্দা, তবে লাগামের টানে আপনি ঘুরে গেল তার ঘোড়া। পেছন পেছন চাল বেয়ে উঠে চলল একটা পাহাড়ে, গাছপালার ভেতর দিয়ে। পায়ের তলায় ঝরাপাতা আর নরম কাঁটারোপ ঢেকে দিচ্ছে ঘোড়ার খুরের শব্দ।

পাইন বনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল দু-জনে; জিম আগে আগে, পেছনে বেলিন্দা।

মূল রাস্তা ধরে ছুটে যাবে ড্যাগা ও তার দলবল। তবে দু-এক মিনিটের মধ্যেই বুঝে ফেলবে, ধোঁকা দেয়া হয়েছে তাদেরকে। ফিরবে তখন। জিমেরা কোনদিক দিয়ে গেছে, বুঝে যাবে সহজেই। আবার পিছু নেবে।

পাহাড়ী পথের ডান পাশে খাড়া দেয়াল। ঘন অন্ধকার এখানটায়। দেয়ালের ধার ঘেঁষে রইল জিম। আরেকটু এগিয়ে ওরু হলো আরেকটা দেয়াল, বাঁ পাশে। বঙ্গ ক্যানিয়ন নয়তো! সর্বনাশ হবে তাহলে।

পেছনে শোনা গেল চিৎকার। দুয়ে। বোঝা গেল, ওরা কোন পথ দিয়ে গেছে আবিষ্কার করে ফেলেছে ড্যাগা। ছুটে আসবে এখন দ্রুতগতিতে।

সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের বড় বড় চাঙড়। মাঝে মাঝে ফাঁক। সুরু ওই ফাঁটলের ভেতর দিয়েই পথ করে করে এগিয়ে চলল জিম, পেছনে বেলিন্দা। মাঝে মাঝে পথ সামান্য চওড়া হচ্ছে, পাশাপাশি চলা যাচ্ছে তখন। টুকটাক কথা বলতে পারছে। তবে খামছে না মুহূর্তের জন্যে। বাঁচতে হলে এগিয়ে যেতে হবে। পেছন থেকে খসতে হবে ড্যাগাকে। অসম্ভবই মনে হচ্ছে কাঙ্ক্ষা।

দু-দিক থেকে ধীরে ধীরে চেষ্টে আসছে দুটো দেয়াল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য পাথরের চাঙড়, ওগুলো আরও বড়। কাছেই কোথাও পানি পড়ছে, শব্দ আসছে কানে। রাতের শীতল বাতাস কেমন ভেজা পরশ বুলান্নে মুখে। নাকে আসছে পাইনের নেশা ধরানো গন্ধ। সামনে বন, ওখানে লুকিয়ে থাকা যাবে। কিন্তু অস্বস্তি-এখটা গেল না জিমের। মাথার অনেক ওপরে উঠে গেছে দু-পাশের দেয়াল, এর ঠাণ্ডে কোথাও ফাটল চোখে পড়ছে না। বঙ্গ ক্যানিয়ন হলে সামনের দুটো দেয়াল এক হয়ে মিশে যাবে, তাহলেই হয়েছে। বোতলের ভেতর ঢুকে যাওয়া পোকার অবস্থা হবে ওদের। খোলা মুখটা রুদ্ধ করে দেয়া খুবই সহজ হবে শত্রুদের পক্ষে, রাইফেল হাতে তখন মাত্র একজন লোকই ওদেরকে ঠেকিয়ে

দিতে যথেষ্ট।

ধীরে ধীরে উঠে গেছে পথটা। কয়েক মিনিট চলে সমতল ছোট্ট একটা তৃণভূমিতে উঠে এল দুটো ঘোড়া। চাঁদ উঠছে। তবে খাড়া দেয়ালের জন্যে এখনও আলো এসে পৌছায়নি এই গভীর পিরিসঙ্কটে।

পেছন থেকে পাশে চলে এল বেলিন্দা। 'জিম,' এই প্রথম নাম ধরে ডাকল সে, 'মনে হয় ফাঁদে পড়ছি। খাঁচা। খুব সম্ভব এটা বঙ্গ ক্যানিয়ন। এদিকে আঙ্গিনি কখনও, তবে এর কথা অনেক শুনেছি। বেরোতে হলে আবার পিছিয়ে যেতে হবে, সামনে পথ নেই।'

'আমিও এই আশঙ্কাই করছিলাম।' থামার নির্দেশ দিতে হলো না, নিজে নিজেই দাঁড়িয়ে গেল জিমের ঘোড়া। কানে আসছে পানি পড়ার আওয়াজ। ঘোড়াটাকে আগে বাড়ানোর চেষ্টা করল সে, কিন্তু গ্যাট হয়ে রইল ওটা। লাক দিয়ে নেমে পড়ল জিম। সামনের অন্ধকারের দিকে চেয়ে বলল, 'পুকুর। পানি। যাক, ভালই হলো। রাতটা যাক, মনে দৈর্ঘ্য, কি করা যায়।'

এক জায়গায় কয়েকটা বড় বড় গোল পাথর পড়ে আছে। ওগুলোর মাঝখানে ক্যাম্প করা যাবে।

দুটো ঘোড়ার জিন খুলে পেছনের ছোট্ট একটুকরো তৃণভূমিতে নিয়ে গিয়ে বাঁধল জিম। চমৎকার ঘাস। ঘোড়ার খাবারের অভাব হবে না।

পাথরগুলোর মাঝখানে ঢুকে পাশাপাশি বসল দু-জনে। অনেক রাত অবধি গল্প করল। খই ফুটতে লাগল যেন মুখে।

নিজের জীবনের অনেক কথা জানাল জিম। নিউসেসে কাটিয়েছে কৈশোর। চোদ্দ বছর বয়সে চলে গিয়েছিল মেক্সিকোতে, ঘোড়া শিকারীদের সঙ্গে। জ্যাস্ত ঘোড়া ধরে আনা খুবই বিপজ্জনক কাজ। ফেরার পথে আক্রমণ করে বসেছিল অ্যাপাচি ইন্ডিয়ানরা। মোট তিনবার লড়াই হয়েছিল ওদের সঙ্গে; দক্ষিণ সীমান্তের কাছাকাছি দু-বার, একবার তার খানিকটা উত্তরে।

কখন শুয়ে পড়ল, ঘুমিয়ে পড়ল কখন, বলতে পারবে না জিম। হঠাৎ করেই ঘুম ভেঙে গেল। চোখে পড়ল ধূসর আকাশ। রাত শেষ। পাতশে তাকাল। কাছেই কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘাসের ওপর শুয়ে আছে বেলিন্দা। একটা হাতে পড়ে আছে জিমের বিশাল বুক। ঠোঁট দুটো আধখোলা, কোনরকম দৃষ্টিভঙ্গি ছাপ নেই চেহারায়। ভোরের আবহা আলোয় অনেক বেশি সুন্দরী দেখাচ্ছে তাকে।

বুক চুমু খাবার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে রোধ করল জিম। বুকের ওপর থেকে আশু করে নামিয়ে রাখল হাতটা। আঙুল দিয়ে সরিয়ে দিল বেলিন্দার গাল এসে পড়া একগুচ্ছ চুল। উঠে পড়ল। এগিয়ে গেল ঘোড়া দুটোর দিকে।

ঘন হয়ে জন্মেছে সবুজ, রসালো ঘাস। চারদিকে তাকিয়ে নিজেদের অবস্থান লক্ষ করল সে। খোলা একটা চতুর্ভুজ জায়গায় রয়েছে। সামনে পুকুর, ওপারে এক হয়ে মিশে গেছে দু-দিকের দেয়াল। যেখানে মিশেছে সেখানটাতেই উচ্চতা কম,

তা-ও প্রায় তিনশো ফুট। একরথানেক মত হবে জলাশয়টা। টলটলে স্বচ্ছ পরিষ্কার পানি। একপাশের পাহাড় চড়া থেকে ঝরে পড়া বর্না থেকেই এর উৎপত্তি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাইন গাছ জন্মেছে পুকুরের পাড়ে। এদিক ওদিক পড়ে আছে অসংখ্য ছোটবড় পাথর। পেছনে, গিরিন্দরটের দু-ধারে ঘন ঝোপঝাড়। তিনদিক ঘেরা জায়গাটায় বেরোনোর একটাই পথ, সেটা নিশ্চয় দখল করে বসে আছে ড্যাগা আর তার দলবল। তবে, ওদের দু-জনের অবস্থানও যথেষ্ট ভাল, বেরোতে পারবে না, এই যা সমস্যা। চতুরের পাথরের আড়ালে বসে একটা মাঠ রাইফেল দিয়েই ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব গিরিপথ ধরে এগিয়ে আসা সেনাবাহিনীর গোটা একটা দলকে।

শেট ভরে ঘাস খেয়েছে ঘোড়া দুটো। পানি খাওয়াল জিম। তারপর আবার আগের জায়গায় এনে বাঁধল। একটা পাথরের ধারে বসে আঙন জেলে কফির পানি চড়াল। পুকুরের পানিতে অনেক মাছ, বিশেষ করে ট্রাউট। এদিকটায় আসে না কেউ, মাছগুলোকে বিরক্ত করে না। বড়শি ফেলতেই টোপ গিলে নিল ইয়া বড় এক ট্রাউট। মাছটা নিয়ে ফিরে এসে দেখল পানি ফুঁছে।

পাথরের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল বেলিন্দা। হাসিতে উজ্জ্বল মুখ। 'কি হচ্ছে? পিকনিক?'

জিমও হাসল। হাত বোলাল গালে। কয়েকদিন শেড করতে পারেনি, খোঁচা খোঁচা দাড়ি। 'দূর, এই দাড়িভর্তি মুখ নিয়ে পিকনিক!' তাকাল বেলিন্দার মুখের দিকে। 'এখানে রাত কাটাতে হবে, ভেবেছ কখনও?'

'ভাবিনি। কাটাতে কিন্তু খারাপ লাগেনি।'

'সত্যি?'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল বেলিন্দা।

'ভাল। শোনো,' কাজের কথায় এল জিম, 'রাইফেল চালাতে পারো? ড্যাগার খোঁকারা এলে কতক্ষণ ঠেকাতে পারবে?'

ফিরে তাকাল বেলিন্দা। গিরিপথটা দেখল। চতুরের ওদিকের প্রান্তে, প্রায় যাট ফুট দূরে একটা বড় পাথর। সামনের পথ খুবই সরু। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'সহজে এখানে উঠে আসতে দেব না কাউকে। কেন?'

তিনশো ফুট উঁচু দেয়ালটা দেখল জিম, 'আমি ওখান দিয়ে বেরিয়ে যাব। একা হলে পারব, তোমাকে নেয়া যাবে না।'

রক্ত সরে গেল বেলিন্দার মুখ থেকে। 'অসম্ভব! এত খাড়া দেয়াল...কোন দরকার নেই, জিম। চুলোয় যাক রায়্ফ। লাগবে না আমার। এখানেই বসে থাকব, রায়্ফটা বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত। বেরোবই না।'

'হেরে যেতে বলছ? কিছুতেই না।' দুটকঠে ঘোষণা করল জিম। 'এখান থেকে বেরিয়ে যাবই আমি! কেউ ঠেকাতে পারবে না।' অদ্ভুত রকম বদলে গেছে তার চেহারা, কণ্ঠস্বর; মানুষটাকে নতুন লাগছে বেলিন্দার কাছে। 'কুণারের লেজ পা

দিয়েছে ড্যাগা, আমি তাকে ছাড়ব না! ওই রায়্ফ তোমার, বেলিন্দা। জায়গাটা তোমাকে ছাড়া বেমানান। কাল সন্ধ্যায়ই বুকেছি। ওখানে থেকেছ কখনও?'

'জীবনের বেশির ভাগটাই। আমার মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজনরা সবাই ছিল আংকেল হার্ভের বন্ধু। ইভিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধে মারা গেছে সব। তারপর থেকে ওই রায়্ফটাই ছিল আমার বাড়ি।'

'তোমার জন্যে আলাদা করে কিছু রেখে গেছেন মিস্টার হার্ভে?'

'না,' মাথা নাড়ল বেলিন্দা, 'দরকারই মনে করেনি। আংকেল ভেবেছিল, রায়্ফটা কিনে নিতে পারবে জিম, এবং আমি তাকে বিয়ে করব। আর কিসের ভাবনা। তবে একটা ভুল করেছিল আংকেল, আমার আর জিমের মাখামাখিটাকে অন্যভাবে দেখেছিল, কল্পনাই করেনি ভাইবোনের মত ছিলাম আমরা। তবে জিমকে বিয়ে না করলেও আমার কোন অসুবিধে হত না। সে ওটার মালিক হলে আমিও সারাজীবনই থাকতে পারতাম ওখানে।'

খেতে খেতে আরও অনেক কথা হলো। বার বার পাহাড়-চড়াটার দিকে তাকাচ্ছে জিম। কাজটা মোটেও সহজ নয়, তবু যেভাবেই হোক, ডিঙাতেই হবে ওই পাহাড়।

ইঠাং পেছনে গর্জে উঠল রাইফেল। ডাইভ দিয়ে পাথরের আড়ালে এসে পড়ল দু-জনে। কাউকে দেখতে পেল না গিরিপথটায়।

একটা পাথরের আড়াল থেকে চিৎকার করে বলল ড্যাগা, 'বেলিন্দা, তুমি বেরিয়ে আসতে পারো। তোমার কোন ক্ষতি করা হবে না। মাথার ওপর দু-হাত তুলে বেরোলে জিমকেও কিছু করব না।'

বেলিন্দার দিকে তাকাল জিম।

মাথা নাড়ল বেলিন্দা। যাব না।

চৌচৌয়ে জবাব দিল জিম, 'এখানেই আমাদের পছন্দ! বেশি দরকার থাকলে এসে ধরে নিয়ে যাও।'

নীরবতা।

ফিসফিস করে বলল বেলিন্দা, 'ও বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না। শহরে যেতেই হবে। নিলাম ডাকার সময় থাকতে হবে ওখানে।'

'রাইফেলটা তুলে নাও,' বলল জিম। 'এগোলেই গুলি চালাবে। সোজা মেরে ফেলবে, কোন মায়াদম্বা নেই। আমি যাচ্ছি।'

উঠে দাঁড়াল জিম। ক্ষয়ে যাওয়া ধূসর বিশাল একটা পাথরের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে যাবে দেয়ালের কাছে, যেখান থেকে বর্না নেমেছে। চূড়ায় উঠবে।

'জিম,' মৃদু সলজ্জ কণ্ঠে ডাকল বেলিন্দা।

ডাকটা অন্যরকম। ফিরে তাকাল জিম।

ইশারায় কাছে ডাকল বেলিন্দা। পরক্ষণেই চোখ নামাল। রক্ত জমেছে গালে।

কাছে এসে দাঁড়াল জিম। উঁচু হয়ে তার গালে টুক করে চুমু খেল বেলিন্দা।

শত বাধা সত্ত্বেও উঠে চলল ধীরে ধীরে।

প্রতিটি মুহূর্তকে একেকটা ফুর্গ বলে মনে হচ্ছে জিমের। সময়ের হিসেব রাখতে পারছে না, প্রয়োজনও মনে করছে না। ভাবনা একটাই, ওপরে উঠে যাওয়া। কিন্তু মনের সেই জোরও হারাল একসময়। বিচিত্র একটা ইচ্ছে হতে লাগল, পা সরিয়ে এনে শরীরটাকে ছেড়ে দিতে। একপর যা হয় হোক! এই কষ্টের চেয়ে মরাও যেন এখন মহাশান্তি।

জোর করে ইচ্ছেটাকে দমন করল সে। ওপর দিকে তাকাল। আরি, পৌছে গেছে তো! আর মাত্র ফুট বিশেক বাকি।

নতুন উদ্যমে আবার উঠতে লাগল। কিন্তু ফুট দুয়েক ওঠার পরই উদ্যম শেষ। অবশ হয়ে গেছে পিঠের মাংসপেশী। আর মাত্র আঠারো ফুট, কিন্তু মনে হতে লাগল আঠারো মাইল।

আরেক ফুট উঠেছে, এই সময় গর্জে উঠল আবার রাইফেল। কয়েক ইঞ্চি দূরে শাট করে এসে লাগল বুলেট, চিলতে উঠে গেল পাথরের। ভীষণ চমকে গেল জিম, পায়ের চাপে তিল পড়ল। সড়সড় করে নেমে চলে এল ফুটখানেক। ধড়াস ধড়াস করছে বৃকের ভেতর। প্রাণপণ চেষ্টায় পায়ের চাপ আবার বাড়িয়ে পতন রোধ করল কোনমতে। হৃৎপিণ্ডটা এত জোরে লাফাচ্ছে, ভয় হচ্ছে ওটার ঝাঁকুনিতেই নিচে পড়ে যাবে।

আর নিচের দিকে না তাকিয়ে পারল না সে। প্রায় তিনশো ফুট নিচের দিকে তাকিয়ে মুখ বাকাল নিজের অজান্তেই। পড়লে কি দশা হবে আন্দাজ করতে পারছে। ভর্তী হয়ে যাবে শরীরটা। বেলিন্দাও হয়তো তখন তার কুৎসিত লাশটার দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠবে।

বেলিন্দাকে কথা দিয়ে এসেছে সে, মরবে না। অপেক্ষা করতে বলে এসেছে। জীবনে কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেনি জিম। যাকে যা কথা দিয়েছে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। বেলিন্দার সুন্দর মুখটার কথা মনে পড়তেই সাহস ফিরে এল মনে। নতুন উদ্যমে আবার পা বাড়াল ওপর দিকে।

ঠিক এই সময় আবার গুলির শব্দ।
চড়াং করে মুখের কয়েক ইঞ্চি দূরে পাথরের চিলতে উঠে গেল। গিরিপথের দিক থেকে ভেসে এল সম্মিলিত চিৎকার। গর্জে উঠল রাইফেল। বেলিন্দা গুলি করছে। হটানোর চেষ্টা করছে ডাকাতেগুলোকে।

একমাগাড়ে কয়েকবার গুলি চালানোর পর চূপচাপ। হয়তো ম্যাগাজিনে নতুন গুলি ভরছে বেলিন্দা।

প্রাণপণে উঠে চলল জিম।
হঠাৎ যেমন খেমে গিয়েছিল, তেমনি হঠাৎই আবার গর্জে উঠল রাইফেল। পাথরের আড়াল থেকে লোকগুলোকে বেরোতেই দিচ্ছে না বেলিন্দা। ভালবসত নিশানা করার সুযোগ দিচ্ছে না। তাহলে জিমকে মিস করত না।

বেলিন্দার গুলির পাল্টা জবাব দিতে লাগল ওরা। তবে অযথা। কিছুই যে করতে পারছে না, লাগাতে পারছে না, বোঝা যাচ্ছে।

হঠাৎ খেমে গেল গোলাগুলি। একেবারে নীরব। ভয় পেয়ে গেল জিম। গুলি খেলো না-তো বেলিন্দা! না তাকিয়ে আর পারল না সে। দেখল, পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বেলিন্দা। গুলি খায়নি। সামান্য কুঁজা হয়ে ছুটল গিরিপথের দিকে। ছুঁতে ছুঁতেই গুলি চালান।

তাকে কভার দেয়ার জন্যে মস্ত ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে বেলিন্দা। ওরা গুলি করলেই এখন মেরে ফেলতে পারে। তারপর বড়জোর আর একটা গুলি, ব্যস, জিমও শেষ।

গায়ে যেন অসুর ভর করল এসে জিমের। কি করে এর পরের কয়েকটা ফুট উঠল, বলতে পারবে না। হঠাৎ বাতাসের হালকা পরশ লাগল গালে। মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখল চূড়ায় পৌছে গেছে।

উপত্যকার দিক থেকে রাইফেল গর্জে উঠল একবার। শাট করে এসে চূড়ার কিনারে লাগল বুলেট। পাথরের চিৎকারে ছিটিয়ে তীব্র শিশ কেটে বেরিয়ে গেল।

থাবা মারল জিম। আঁকড়ে ধরল ফাটলের কিনারা। জোরে একবার দোলা দিয়ে শরীরটাকে ডিগবাজি খাওয়াল। মিস করলেই গিয়েছিল। কিন্তু করল না। আছড়ে এসে পড়ল চূড়ার পাথুরে সমতলে।

হাত-পা কাঁপছে থরথর করে। শরীর অবশ। বৃকের খাঁচায় প্রচণ্ড লাফালাফি করছে হৃৎপিণ্ডটা। গুমে পড়তে ইচ্ছে করছে। কিন্তু নষ্ট করার মত সময় নেই। জিরানোর সময়ও নেই। তাকে বাঁচাতে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছে বেলিন্দা।

হামাগুড়ি দিয়ে কয়েক ফুট সরে এল জিম। উঠে দাঁড়াল। মাথা ঘুরছে, টলছে শরীর।

মাথা ঝাড়া দিয়ে জড়তা দূর করার চেষ্টা করল সে। আশপাশে, নিচে তাকাল। দক্ষিণে অনেক দূরে চোখে পড়ছে টাকার শহর।

বসে গলায় ঝোলানো বৃট খুলে নিয়ে পরল। নামতে শুরু করল ঢাল বেয়ে। নামতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হচ্ছে না। এখনও কাঁপছে হাত-পা, কয়েয়ার করল না। লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে চলল দ্রুত। লক্ষ্য দক্ষিণে। শহরে পৌঁছতে হবে।

মনে পড়ল, নিচে কোথাও রয়েছে বর্নটা। একটা গিরিসঙ্কটের ভেতর দিয়ে বয়ে গিয়ে বেরিয়েছে উপত্যকায়। তৃণভূমিকে দু-ভাগ করে এগিয়ে গেছে মরুভূমির দিকে। এখান থেকে দেখা যায় না ওটা।

নিচে, দক্ষিণে তাকাল জিম। একটা মালভূমি চোখে পড়ছে। সিডার গাছের ঘন জঙ্গল। ওটার ওপারের নিশ্চয় রয়েছে বর্নটা। তারপরেই চলে গেছে পায়ের চলা পথ, শহরের দিকে।

একটা ঠোড়া হলে অতি সহজেই পৌঁছে যেতে পারত শহরে। কিন্তু নেই যখন

হেঁটেই যেতে হবে। পাহাড়ী পথ ধরে শর্টকাটেও দূরত্ব দশ মাইলের কম হবে না। পথটা পেরোতেই হবে, শহরে পৌঁছে দেখা করতে হবে উকিলের সঙ্গে। বেলিন্দা কি বেঁচে আছে? আর কোন গুলির শব্দ নেই কেন? মেরে ফেলল না তো?

দরদর করে ঘামছে জিম, হাঁপাচ্ছে জোরে জোরে। থেমে রুমাল বের করল পকেট থেকে। রপালের ঘাম মুছল। সামনেই কয়েক গজ নিচে গিরিসঙ্ঘট! এশারের দেয়াল তত খাড়া নয়, মোটা মুটি ঢালু।

শুয়ে পড়ল জিম। গড়াতে শুরু করল ঢাল বেয়ে। গড়াতে গড়াতেই নেমে এল নিচে। কনুই আর হাঁটুর কাছে কাপড় ছিড়ে গিয়ে চামড়া ছিলে গেছে। কাঁটালতায় লেগে কেটে গেছে মুখের চামড়া, রক্ত বেরোচ্ছে। কিন্তু গ্রাসাই করল না সে। নিচে নেমেই ছুঁতে শুরু করল সামনের মালভূমির দিকে।

আধ ঘণ্টা পর। রক্ত আর ঘামে কালচে হয়ে গেছে শার্টের জায়গায় জায়গায়। গিরিপথ চওড়া হয়ে এল সামনে হঠাৎ। একটা মোড় নিয়েই শেষ হয়ে গেল। সামনে বিস্তৃত মালভূমি। ধূলা উড়ছে। কেউ আছে নিচয়।

গিরিপথের মুখের কাছে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল জিম। হামাগুড়ি দিয়ে চলে এল একটা বোম্বের আড়ালে। কান খাড়া।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। কথা বলে উঠল ক্রেউ, 'আর কোন সাড়াশব্দ নেই ওদের! কি হলো!'

'কি জানি!' জবাব দিল আরেকটা কষ্ট। হালকা গলা, নাকে লাগিয়ে কথা বলে। 'হয়তো দূরে কোথাও চলে গেছে। এতদূর থেকে এখানে পৌঁছাচ্ছে না গুলির আওয়াজ।'

'চলো, শেরিফ,' বলল প্রথম কষ্টটা। 'গরম খুব বেশি এখানে। চলো, হার্ভে-র্যাঙ্কের কুয়া থেকে পানি খেয়ে আসি।'

উঠে দাঁড়াল জিম? বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়। 'শেরিফ, একটু দাঁড়ান। আমাকে খুঁজছিলেন?'

লম্বা মানুষ শেরিফ। ধূসর চুল। ইয়া বড় গৌফ, চোখা হয়ে গালের ওপর উঠে গেছে দু-দিকের প্রান্ত। নীল চোখে ঈগলের দৃষ্টি। 'বোম্যান? চেহারায় অবশ্য তাই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, তোমাকেই খুঁজছি। কিন্তু যেচে এসে ধরা দেবার এত সাধ কেন?'

ক্ষত কারণ ব্যাখ্যা করল জিম। 'বেলিন্দা গ্যাটলিনকে আটকে রেখেছে ওরা। শেরিফ, জলদি চলুন আমার সঙ্গে, প্লীজ! জলদি...'

'কে আটকেছে?' তীক্ষ্ণ চোখে জিমকে দেখছে শেরিফ।

'ভাগ্য গানুশ আর তার দল।'

'ভাগ্য? এই একটু আগে তাকে টাকারের দিকে চলে যেতে দেখলাম।'

'তাহলে তো আরও তাড়াতড়ি করতে হবে! নিচয় উকিলের কাছে টাকা

জমা দিতে গেছে। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই শুরু হবে নিলাম!' আনমনে বিড় বিড় করল জিম, বেলিন্দাকে ওরা মারবে না! শুধু সন্ধ্যা পর্যন্ত আটকে রাখবে।' শেরিফের দিকে তাকাল। 'শেরিফ, প্লীজ, আপনি যান। বেলিন্দাকে নিয়ে আসুন। আর দয়া করে আমার সঙ্গে একজন লোক দিন। টাকারের যেতে হবে।'

'কি হবে টাকারের গিয়ে?' ভুরু কঁচাকালা শেরিফ।

'বেলিন্দা গ্যাটলিনের নামে টাকা জমা দেব। র্যাঙ্কটা কিনতে হবে। দু' দু'বার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে সে। তার জন্যে কিছু করতে চাই...'

'কিন্তু তোমাকে তো জেলে ভরা হবে। জিম স্যাবারকে খুন করেছে...'

'আমি করিনি। সে সব কথা পরে হবে, শেরিফ। আগে আমার কথা শুনুন, লোক দিন। আপনি যান, বেলিন্দার কোন ক্ষতি হওয়ার আগেই...'

'বেলিন্দাকে বড়জোর আটকে রাখবে ওরা। র্যাঙ্ক কিনে এ-অঞ্চলেই বাস করতে হবে ভ্যাগাকে। মেয়েমানুষ খুন করলে কেউ সহ্য করবে না, টিকতেই পারবে না সে এখানে...'

'ঠিক আছে, তার ব্যাপারে যা ভাল বোঝোন করুন। লোক দিন আমাকে। দেরি হয়ে গেলে নিলাম শুরু হয়ে যাবে। আমার কাছে দশ হাজার ডলার আছে। ওটা উকিলের হাতে পৌঁছে দিই আগে। তারপর আমাকে জেলে ভরেন, যা-ই করেন, কোন আপত্তি নেই।'

হাভিড-সর্বথ চিবুকে হাত বোলাল শেরিফ। 'অনেক দিন আগে আমাকে সঙ্গে নিয়েই এখানে এসেছিল বিল হার্ভে। আমিই তাকে পছন্দ করে দিয়েছিলাম জায়গাটা, র্যাঙ্ক করার জন্যে। সে কি চাইত, খুব ভাল করেই জানি আমি।' হঠাৎ ফিরল সহকারীর দিকে, 'হোরউইক, হার্ভে-র্যাঙ্ক তো তুমি চাও না, নাকি?'

'না, শেরিফ,' মাথা নাড়ল হোরউইক। 'হার্ভে হার্ভের দীর্ঘস্থাস মঙ্গল আনবে না আমার। টাকা আছে, খরচ করব। চোর ডাকাতে দমন করব। আর কিছুই চাই না আমি। তোমার সহকারী হয়ে থাকাই পছন্দ আমার। জীবনে একঘেয়েমী থাকে না।'

'তাহলে আজ আর কুয়ার পানি খেতে পারছ না। এই ছেলোটাকে নিয়ে যেতে হবে। উকিলের কাছে টাকা পৌঁছে দেয়ার পর নিয়ে গিয়ে হাজতে ভরবে।'

লম্বা হালকা-পাতলা লোক হোরউইক। নিচের দিকে ঝুলে পড়া চোয়াল। শেরিফের দিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকাল। 'কুয়ার পানি খুব খেতে ইচ্ছে করছিল। ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ, আরেক দিন খাওয়া যাবে। জরুরী কাজটাই সারি আগে।' জিমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এসো হে, স্যাবারই হও আর বোম্যানই হও, জিমটা তো ঠিক। ওই নামেই ডাকব। চলো, যাই।'

ঘোড়া দেয়া হলো জিমকে।

দূলের অন্যদের নিয়ে গিরিসঙ্ঘটের দিকে রওনা হয়ে গেল শেরিফ।

জিমকে নিয়ে হোরউইক চলল টাকারে।

ফ্যাকাসে-সবুজ সেজঝোপ আর সিডারের জঙ্গল পেরিয়ে এল ওরা। নামল মালভূমি থেকে। সামনে মরুভূমি।

‘এদিক দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি হবে,’ বলল হোরউইক। ‘এখানে সহজে কেউ আসতে চায় না, তাই কারও ওত পেতে থাকার ভয় কম।’

ঠিক দুপুর। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। আঙন ছড়াচ্ছে যেন সূর্য। আগে আগে চলছে হোরউইক, গুরুতে কয়েকবার ঘন ঘন পেছনে ফিরে তাকাল। দেখল, জিম আসছে কিনা।

অবাকই হলো জিম। তাকে যেন একটু বেশিই সুযোগ দিচ্ছে লোকটা! পালানোর সুযোগ? সে পালায় কিনা পরীক্ষা করছে নাকি?

হোরউইক যা ভাবে ভাবুক, জিমের কিছু না। একজন সঙ্গী আর ঘোড়া পেয়ে গিয়ে স্তম্ভির নিঃশ্বাস ফেলেছে সে। তার এখন একটাই উদ্দেশ্য, তাড়াতাড়ি টাকারে গিয়ে উকিলের সঙ্গে দেখা করা।

দ্রুত এগিয়ে চলল দুই ঘোড়সওয়ার। চোখের সামনে নাচছে বাতাস, তাতে এক ধরনের অদ্ভুত ঝিলমিল। মরুভূমিতে প্রচণ্ড রৌদ্রতাপের ফলে ঘটে এটা। একবিন্দু হাওয়া নেই। স্থির হয়ে আছে বালির সমুদ্র। গনগনে চুল্লির ওপর দিয়ে ছুটে চলছে যেন দুটো ঘোড়া।

গতি একটু কমিয়ে জিমের পাশে চলে এল হোরউইক। ‘বেশি জোরে চালিও না হে, ঘোড়াগুলো সইতে পারবে না। এরা মরলে আমরাও মরব।’

কয়েক কদম পাশাপাশি হাঁটল দুটো ঘোড়া। ফিরে তাকাল আবার হোরউইক। ‘আমার মনে হয়, লোকটা তুমি সৎই।’ পালিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছি, যাওনি।’ হাসল। ‘ভালই করছ। বেশিদূর যেতে পারতে না। গুলি করে কখনও মিস করেছি কিনা, মনে নেই।’

‘পালানোর কোন কারণ নেই আমার,’ জবাব দিল জিম। ‘কোন অন্যায় করিনি। জীবনে প্রথম এসেছি টাকারে। গোলমালে জড়িয়ে পড়েছি যে, এটা নিতান্তই একটা দুর্ঘটনা।’

পরের আধমাইল পাশাপাশি এগোল ওরা। নীরবে।

সামনে পাথর আর টিলার ছড়াছড়ি। কপালে হাত রেখে রোদ বাঁচিয়ে তাকাল দু-জনেই। হলুদ মাটির একটা টিলার পাশে কয়েকটা গাছ। বড় একটা গাছের ডালে বসে আছে ছয়টা বিশাল কুৎসিত পাখি, মরুর শকুন।

‘মড়া দেখেছে,’ বলল হোরউইক। ‘এসো তো, দেখেই যাই কি দেখল?’

সামান্য মোড় নিয়ে এগোল ওরা। শ-দুয়েক গজ এসে রাশ টেনে দাঁড় করাল ঘোড়া।

সিডার গাছগুলোর ঘেরের ভেতরে বালিতে ছড়ানো একটা গর্ত, বিশাল পিরিচের মত দেখতে। ওটাতে পড়ে আছে একটা ঘোড়া। ছিড়েখুঁড়ে ফেলেছে

শকুনের দল। ঘোড়াটার চামড়ার রঙ ধূসর। বাকানো ধারাল ঠোঁট দিয়ে মাংস ছিড়ে খাচ্ছে এখনও কয়েকটা শকুন। আগলুকদের দেখে বিশাল ডানা ঝাপটে উড়ে গিয়ে বসল গাছে।

হিয়ান্ডির ঘোড়াটার দিকে চেয়ে বালিতে থু-থু ফেলল হোরউইক। ‘জিম স্যাবারের ঘোড়া। ওই যে, জিনটা পড়ে আছে।’

এগিয়ে গিয়ে পিরিচটার চারপাশে একবার চক্কর দিল দু-জনে। হঠাৎ হাত তুলে দেখাল জিম। ‘দেখুন, এখানে মরেনি স্যাবার! হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেছে!’

‘হ্যাঁ,’ হোরউইক গম্ভীর। ‘তবে বেশিদূর যেতে পারেনি, বোঝা যায়। অনেক বেশি রক্তক্ষরণ হয়েছে, দেখতে পাচ্ছে?’

ঘোড়া থেকে নামল দু-জনে। মুখ ধমধমে। কি দেখতে পাবে, জানা আছে। এগোতে চাইছে না। দেখতে চাইছে না বীভৎস দৃশ্যটা।

কিন্তু দেখা দরকার। অবশেষে কাঁধে ঝোলানো রাইফেল খুলে নিল হোরউইক। ‘জিম স্যাবার আমার বন্ধু ছিল,’ নিজেকেই বোঝাল যেন সে। ‘কি হলো ওর, দেখতেই হচ্ছে।’

পঞ্চর চিহ্ন রেখে গেছে বালিতে। সহজেই এগোনো গেল।

দু-বার হুমড়ি খেয়ে পড়ে বিধাম নিয়েছে আহত লোকটা। বেশ অনেকক্ষণ করে। বালিতে শুকিয়ে আছে কালচে রক্ত।

এক জায়গায় হেঁড়া শার্ট পাওয়া গেল। থেমে শার্ট ছিড়েছে স্যাবার। ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধেছে।

চিহ্ন ধরে ধরে এগিয়েই চলল ওরা। সামনে টিলা। পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে খাড়া দেয়াল। সমান করে চটেছে ফেলা হয়েছে যেন দেয়ালটা। এটা বেয়ে উঠে ওপাশে যাওয়ার কোন উপায় নেই।

হাত তুলল হোরউইক, ‘দাঁড়াও।’ আঙুল তুলে নিচে দেখাল, ‘ওই দেখো।’ বালিতে জুতোর ছাপ, হামাগুড়ি দিয়ে যাওয়া আহত লোকটার পাশে পাশে এগিয়ে গেছে।

খুঁদে একটা সেজঝোপের কাছে এসে দাঁড়াল দু-জনে। রক্তের ছিটে শুকিয়ে আছে ফ্যাকাসে-সবুজ লতাপাতায়। ঝোপের পাশে এক জায়গায় বালি সামান্য ডেবে গেছে। তার পাশেও জুতোর ছাপ। একটা ছাপের গোড়ালি বেশি গম্ভীর হয়ে বসেছে বালিতে।

চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে হোরউইকের। ওই ছিটানো রক্ত আর জুতোর গোড়ালি বেশি ডেবে যাবার একটাই ব্যাখ্যা। পাশে পাশে এগিয়ে এসে এখানে থেমেছিল খুঁী। লাথি মেরেছিল আহত লোকটাকে।

বেশি দূর আর এগোতে পারেনি। তবু, আহত লোকটার স্নায়ুর জোর বোঝা গেল। কোন বাধাই তার এগোনো থামাতে পারেনি।

টিলার খাড়া দেয়ালের ধার বেঁধে জন্মে আছে সেজঝোপ, কোথাও ঘন,

৬—মৃত্যুর স্বাদ

কোথাও পাতলা। আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা আকারের পাথর।

ঠিক দেয়ালের গা থেকে তেরছা হয়ে বেরিয়ে থাকা ঘন একটা ঝোপের নিচে পাওয়া গেল লোকটাকে। মুখ খুবড়ে পড়ে আছে। এখানে পৌঁছেও বেশ কিছু সময় হুঁশ ছিল তার, আশেপাশের চিহ্ন দেখে বোঝা যায়। বাবে না, এটা বুঝেছিল জিম স্যাবারও, তবে মৃত্যুর পর কিংবা অর্ধমৃত অবস্থায়ই যাতে শকুনে টেনে ছিঁড়তে না পারে, সেই-জন্মেই এই কষ্টটা করেছে সে।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল হোরউইক। তাকাল জিমের দিকে। সাদাটে-ধূসর চোখ দুটো বরফের মত শীতল। 'জুতোর ছাপের পাশে গিয়ে দাঁড়াও। দেখতে চাই আমি।' রাইফেল তুলে নিয়েছে। নলটা চেয়ে আছে জিমের পেটের দিকে। পাথরের মত স্থির হয়ে আছে রাইফেল ধরা হাত।

হোরউইকের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল জিম। অস্বস্তি বোধ করছে। বুঝতে পারছে, কি অসামান্য এক ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, প্রয়োজনে কতখানি ভয়ঙ্কর হতে পারে এই লোক। স্যাবারের খুঁনী নয় বলে মনে মনে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল সে।

হোরউইকের রাইফেলের দিকে চোখ রেখে ধীরে ধীরে পিছিয়ে গেল জিম। জুতোর ছাপের পাশে দাঁড়াল। ওর জুতোর সঙ্গে মিলে গেলই সর্বনাশ।

কিন্তু না, মিলল না। তার জুতোর যে ছাপ পড়ল তার চেয়ে ইঞ্চিখানেক বড় খুঁনির জুতোর ছাপ। সোলও অন্যরকম। হাঁপ ছাড়ল সে।

'হুঁ, আস্তে আস্তে মাথা দোলাল হোরউইক। 'মিলছে না! কিন্তু আরও শিওর হতে চাই। কি করে হব...' গাল চুলকাতে শুরু করল সে।

বাথা দিয়ে জিম বলল, 'দেখুন, দেয়ালে কি যেন লেখা...'

জিমের দিক থেকে চোখ সরাল না হোরউইক। চালাকির চেষ্টা করছে কিনা বুঝে নিল। রাইফেলের নলের মুখ একটুও না সরিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল দেয়ালের দিকে। মিথ্যে বলেনি জিম, সত্যিই কিছু লেখা রয়েছে।

এগিয়ে গিয়ে টিলার গোড়ায় দাঁড়াল দু-জনে। স্যাবার যে ঝোপটায় পড়ে আছে, তার সামান্য দূরে স্ট্রেট পাথরের কালচে দেয়ালে সাদাটে পাথরের চোখা মাথা দিয়ে লেখা :

ড্যাগা আমাকে খু

অসম্ভব রয়েছে বাক্যটা। এর বেশি আর লিখতে পারেনি। মারা গেছে। আগুন ঝিলিক দিয়ে উঠল হোরউইকের চোখে। স্যাবারের লাশটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিছু মনে করো না, বন্ধু, আরও কয়েকটা ঘণ্টা থাকতে হবে তোমাকে এখানে।' জিমের দিকে ফিরল, 'চলো। ড্যাগাকে দরকার আমার!'

চুড়ায় উঠে জিমকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল বেলিন্দা। তাকে সুযোগ দেয়ার জন্যে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়েছিল। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে গুলি করতে করতে ছুটেছিল

সামনে। সহজেই তাকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারত তখন ড্যাগার লোকেরা। মারেনি। কেন? আরেকটা পাথরের আড়ালে আবার লুকিয়ে পড়ার সুযোগ কেন দিল?

হঠাৎ বুঝে গেল বেলিন্দা কারণটা। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় আছে, এর মধ্যে টাকা দিতে না পারলে শুরু হয়ে যাবে নিলাম ডাকা। ড্যাগা নিশ্চয় চলে গেছে। বেলিন্দাকে আটকে রাখার নির্দেশ দিয়ে গেছে দলের লোকদের।

জিম বেরিয়ে গেছে, কিন্তু ঘোড়া নেই। হেঁটে যেতে হবে। অনেক সময় লাগবে তাতে। নিলাম ডাকা শুরু হবার আগে কিছুতেই পৌঁছতে পারবে না টাকারে। তাছাড়া শেরিফের লোকেরাও ছড়িয়ে পড়েছে। ধরা পড়ে যাবে জিম।

এতক্ষণে পরিষ্কার হলো বেলিন্দার কাছে, ওদেরকে মারার ইচ্ছে ছিল না ড্যাগার। চালাকি করে এনে চুকিয়েছে এই বক্স ক্যানিয়নে। আটকে রেখে সময় নষ্ট করার জন্যে। এবং সফল হয়েছে সে।

আর কোন আশা নেই হার্ভে-র্যাঞ্চ পাওয়ার। নিজের অজান্তেই বুক ভেঙে বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস।

টাকারের পথে আজ লোক চলাচল বেশি। সাধারণত এতটা থাকে না। উকিলের অফিসের সামনে ভিড়।

ঘোড়া থেকে নামল জিম এবং হোরউইক। ঘোড়া দুটো বাঁধল খুঁটির সঙ্গে।

'তুমি ভেতরে যাও,' জিমকে বলল হোরউইক। উইনচেস্টারের গায়ে থাকা দিল। 'আমি ড্যাগাকে খুঁজতে যাবি।'

'আমি আসব সঙ্গে?' বলল জিম।

'যাও তো, নিজের কাজ সারোগে,' ধমক লাগাল হোরউইক। 'বুড়ো হয়েছি বটে। কিন্তু ড্যাগার মত একটা শয়তানকে সামলাতে কারও সাহায্য লাগবে না আমার।'

সুইং ডোর ঠেলে খুলে ঘরের ভেতর পা রাখল জিম।

বিরাট ডেকের ওপাশে বসে আছেন এক বৃদ্ধ। লম্বা, রোগাটে শরীর। ধূসর হয়ে এসেছে চুল। চোখ তুলে তাকালেন।

'আপনি উকিল বেন রাউনি?' জিজ্ঞেস করল জিম।

মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ।

এগিয়ে গিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড়াল জিম। কোমরের বেল্টের গোপন ভাঁজ থেকে বের করল একতাড়ী নোট। টেবিলের ওপর রেখে ঠেলে দিল। এখানে দশ হাজার আছে। হার্ভে-র্যাঞ্চের জন্যে প্রথম কিস্তি। নাম বদলে বেলিন্দা অ্যাও বোম্যান র্যাঞ্চ লিখুন।

উজ্জ্বল হলো বেন রাউনির চোখ। 'তুমি মেয়েটার পার্টনার? ওর হয়ে টাকা মৃত্যুর স্বাদ

জমা দিচ্ছে?' জবাবের অপেক্ষা না করেই বললেন, 'বেশ বেশ। খুব খুশি হলাম। তুমি ছেলে একটা কাজের কাজই করলে।'

'নামেই শুধু পার্টনার,' বলল জিম। 'দলিলে আমার নাম লিখবেন না। বেলিন্দার একজন সাহায্যকারী দরকার, সাহায্য করছি আমি, ব্যস।'

নোটের তাড়া টেনে নিয়ে গুণলেন উকিল। ড্রয়ারে রেখে চাবি আটকালেন। সামনে বুকো মাথা সামান্য কাঁচ করে তাকিয়ে হাসলেন। 'বেলিন্দাকে তুমি ভালবাস, না?'

ঘাড় চুলকাল জিম। হেসে মাথা ঝাঁকাল।

'কিন্তু স্যাবারকে খুন করতে গেল কেন?'

সোজা হয়ে গেল জিম। হাসি চলে গেল মুখ থেকে। 'কে বলেছে?'

'ড্যাগা গালুশ।' এই তো মিনিট বিশেক আগে এসেছিল। বলল সব কথা।'

'মিথো বলেছে!'

সংক্ষেপে উকিলকে জানাল সব জিম। লাশটা কোথায় পড়ে আছে তা-ও বলল।

মাথা দোলালেন উকিল। 'হঁ, আমারও এরকমই একটা সন্দেহ হচ্ছিল। ড্যাগার কথা বিশ্বাস করিনি। বুড়ো হার্ভেও দুর্ঘটনায় মরেনি, ও-ই খুন করেছে। যাক, শেষ পর্যন্ত নিতে পারল না র‍্যাঞ্চটা...আচ্ছা, এখন এসো। জরুরী কিছু কাজ আছে...'

উকিলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল জিম। গালে হাত বোলাল একবার। বিচ্ছিরি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। না কামালেই নয়।

চোখের ওপর হ্যাটের কানা টেনে নামাল হোরউইক, রোদ বাঁচানোর জন্যে। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল একবার ডানে, একবার বাঁয়ে। অনেক লোক আছে পথে, ওদের মধ্যে দেখা গেল না ড্যাগাকে। উকিলের অফিসের সামনে ভিড় বাড়ছে। নিলাম দেখতে এসেছে। ওরা জানে না, হার্ভে-র‍্যাঞ্চের জন্যে আর নিলাম ডাকা হবে না।

একটা লোককে ধরে জিজ্ঞেস করল হোরউইক, ড্যাগাকে দেখেছে কিনা।

লোকটা জানাল, বিশ-পঁচিশ মিনিট আগে উকিলের অফিসে ঢুকেছিল ড্যাগা। তারপর বেরিয়ে গেছে। কোথায় গেছে, জানে না।

স্রুত হেঁটে চলল হোরউইক। পাথর বিছানো পথে ভারি বুটের মশমশ শব্দ হচ্ছে। হাতের রাইফেলটা বাঁকা করে আড়াআড়ি ধরে রেখেছে বুকের ওপর। যেন মানুষথেকো বাঘের সন্ধানে বেরিয়েছে সে, কোপের আড়াল থেকে জানোয়ারটা লাফ দিলেই গুলি চালাতে প্রস্তুত। মুখ-চোখ শান্ত, শুধু ঠোঁটজোড়া চেপে বসেছে একটা আরেকটার সঙ্গে।

এখানে ওখানে কিছুক্ষণ ড্যাগাকে খুঁজল সে। না পেয়ে শেষে চলে এল

মৃত্যুর স্বাদ

বাজারে।

এক জায়গায় একসারিতে কয়েকটা দোকান। বড় একটা দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল হোরউইক। জোরে ধাক্কা দিয়ে খুলল সুইং ডোর। ঘরের সব কটা মুখ একসঙ্গে ঘুরে গেল দরজার দিকে। ড্যাগা নেই এখানেও।

'ড্যাগা গালুশকে দেখেছে কেউ?' জিজ্ঞেস করল হোরউইক।

নীরবে মাথা নাড়ল লোকগুলো।

বুড়ো ব্লোকানদার জানতে চাইল, 'কেন? কিছু করেছে নাকি?'

'জিম স্যাবারকে খুন করেছে।'

স্রুত হয়ে গেল ঘরের প্রতিটি লোক।

এক পা এগিয়ে এল দোকানদার। মাথা ঝাঁকান দিয়ে চিৎকার করল, 'হোরউইক, পাশের সেনলুটা দেখিয়ে বলল, 'চুল কাটছে। নিলামের জন্যে রেডি হচ্ছে...'

সবটা শোনার দরকার মনে করল না হোরউইক। বেরিয়ে এল দোকান থেকে।

রাস্তায় নামল জিম। প্রথমেই চোখ পড়ল রাস্তার ওপাশের বাড়িটার দিকে। কামারশালা। লম্বা এক লোক দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে।

ইতস্তত করল জিম। মোড় নিয়ে হাঁটতে শুরু করল বাজারের দিকে। দাড়িগোঁফের যা অবস্থা, আর না কামালেই নয়।

নাপিতের দোকানটা খুঁজে বের করতে সময় লাগল না। দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। আস্তে ঠেলা দিয়ে পান্না খুলে পা রাখল ভেতরে।

চেয়ারে মাথা এলিয়ে দিয়ে ঘুমাচ্ছে একজন লোক। হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে। পেছনটা দরজার দিকে ফেরানো।

এদিকে পেছন করে বসে আবেকজননের চুল ছাঁটছে নাপিত।

দরজায় শব্দ শুনে ফিরে তাকাল নাপিত। টাক মাথা তার। গোলগাল চেহারা। জিমকে দেখে বড় বড় হয়ে গেল চোখ। ঢোক গিলল।

চেয়ারে বসে আছে যে লোকটা তার বিশাল শরীর। অর্ধেক ছাঁটা হয়েছে চুল। গায়ে জড়ানো একটা সাদা কাপড়। দরজা খোলার শব্দের পর পরই নাপিতের হঠাৎ হাত থেকে যাওয়া সতর্ক করে তুলল তাকে। ফিরে তাকাল। পরক্ষণেই এক বাটকায় ঘুরে গেল চেয়ারসহ, তার চোখও বড় বড় হয়ে গেছে।

'জিম বোয়ান! ধরা পড়ানি এখনও?' কর্কশ কণ্ঠ লোকটার।

গলা শুনেই চিনে ফেলল জিম, এই লোকই ড্যাগা গালুশ। কোমরের কাছে হাত চলে গেল তার। 'পড়েছিলাম, কিন্তু ছেড়ে দিয়েছে হোরউইক।'

ছেড়ে দিয়েছে।'

'হ্যাঁ, হাসল জিম। 'তোমার জন্যে আরও দুঃসংবাদ আছে, ড্যাগা। বেলিন্দার নামে টাকাটা জমা দিয়ে এসেছি আমি উকিলের কাছে।'

মৃত্যুর স্বাদ

৮৫

ড্যাগাকে খবরটা হজম করার সময় দিল জিম। তারপর বলল, 'জিম স্যাবারের লাশটাও খুঁজে পেয়েছি আমরা। মরার আগে দেয়ালে তোমার নাম লিখে গেছে ও। বাঁচতে চাইলে জলদি পানাও। হোরউইক এখন খোপা কুকুর। পাগলের মত খুঁজে বেড়াচ্ছে তোমাকে।'

'ই!' ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বলল ড্যাগার। 'সব কিছুর মূলে তুমি, বোম্যান! আমার সর্বনাশ করেছ তুমি! সব শেষ করেছ...'

কথা শেষ হলো না তার। গুলির শব্দ হলো। ড্যাগার শরীরে জড়ানো সাদা কাপড়ের নিচে হাতটা নড়ে উঠতে দেখল জিম। তবে সরতে দেরি করে ফেলল সামান্য। বুকে লাগল না গুলিটা, লাগল কাঁধে। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। লাটিমের মত পাক খেয়ে ঘুরে গেল শরীরটা। এবং এই পাক খাওয়াতেই বেঁচে গেল দ্বিতীয় গুলিটা থেকে। ঘুরে গিয়ে দরজার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে।

কোলের ওপর রিভলভার রেখেছিল ড্যাগা, তুলে নিয়ে গুলি করেছে কাপড়ের নিচ থেকেই। চোখ দুটো উজ্জ্বল, দাঁত বেরিয়ে পড়েছে বিকৃত আনন্দে।

ঘুম ভেঙে গেল চেয়ারে বসা লোকটার। একবার তাকিয়েই বুঝে নিল পরিস্থিতি। একটা মুহূর্ত সময় নষ্ট করল না, ডাইভ দিয়ে জানালার কাঁচ ভেঙে উড়ে গিয়ে পড়ল বাইরে।

স্তব্ধ হয়ে গেছে বেন সময়। ঘোরের মধ্যে থেকে দেখল জিম, ড্যাগার গায়ের সাদা কাপড়ে ছোট গোল একটা ফুটো, ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

কখন ট্রিগার টিপল সে, বলতে পারবে না। হাতে অনুভব করল রিভলভারের ঝাঁকুনি। একবার...দু-বার...বিকৃত হয়ে যেতে দেখল ড্যাগার চেহারা। রিভলভারের নল ঘুরে যাচ্ছে মেঝের দিকে। গুলি বোরোল প্রচণ্ড শব্দে, মেঝেতে গিয়ে বিধল। অল্পের জন্যে মিস করল ড্যাগার পা।

উঠে দাঁড়াচ্ছে ড্যাগা।

তৃতীয়বার গুলি করল জিম।

যে চেয়ারটায় বসেছিল সেটাতেই পড়ে গেল ড্যাগা। কানের নিচ থেকে রক্ত ছুটছে। ফোয়ারার মত ছিটকে গিয়ে পড়ল সাবান গোলানোর বাটিতে। সাদা ফোনাকে লাল করে দিল।

ঘরের কোণে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে নাগিত। একটা চেয়ার টেনে নিয়েছে সামনে, আড়াল করে রাখতে চাইছে নিজেকে।

বাইরে রাস্তায় পদশব্দ। ছুটে আসছে লোকজন। বাটকা দিয়ে খুলে গেল সেন্সরের দরজা। প্রথম ঢুকল হোরউইক।

কাঁধ চেপে ধরে মেঝেতে বসে পড়েছে জিম।

ছুটে এসে তার পাশে বসে পড়ল হোরউইক। 'জিম...বেশি লেগেছে?... জিম...'

চোখ তুলে তাকাল জিম। চোখে চোখ পড়তে হাসল। আন্তে করে খুঁতনি রাখল হোরউইকের কাঁধে। শনতে পেল, হোরউইক বলছে নাগিতকে, 'ডক, তার পয়সাটা জিমের কাছ থেকে আদায় করে নিও।'

হোরউইক হারাল জিম।

মস্তবড় চাঁদ উঠেছে পাহাড়ের মাথায়। দূর থেকে ভেসে আসছে কয়োটের ডাক। র্যাঙ্ক হাউসের বারান্দায় পাশাপাশি বসেছে বেলিন্দা আর জিম। চুপচাপ দেখছে অপরূপ প্রকৃতি। চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে শিশির-ভেজা তৃণভূমি। মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে যেন গলিত রূপার চওড়া স্রোত।

'জিম?' মৃদুকণ্ঠে ডাকল বেলিন্দা।

'উঁ!' দূরের পাহাড়ের দিকে চেয়ে পাহার জাল বনছে জিম। জ্যোৎস্নায় কালো দেখাচ্ছে লাল পাহাড়।

'কালই চলে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা।

'কেন যাবে, জিম? এখানে তোমার কি অসুবিধে?'

জিম চুপ।

'কই, বললে না?'

'তুমি চাও, আমি থাকি?'

'জোর করই ধরে রাখতাম, যদি জানতাম তোমাকে ভালবাসে এমন কেউ নেই তোমার। যার কাছে কিরে যেতেই হবে তোমাকে।'

জবাব দিল না জিম। ভাবছে।

'বলো না, জিম, কেউ আছে তোমার? যার কাছে যেতে হবে?'

'আছে। বেশ কিছু।'

'মনে!'

'গ'ক' অনেক দুখ দেয়। ওয়াই আমার আপনজন। অনেক দিন দেখি না, মর্নট বড় ছিটকট করছে।' হেসে উঠল জিম।

লাঞ্চ দিয়ে উঠে দাঁড়াল বেলিন্দা। পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল জিমের গলা। 'উঁহ, বাঁচলে আমাকে! কি যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিলাম এ ক'টা দিন! কেউ নেই তোমার, আগে বলানি কেন?'

'তুমি তো জিজ্ঞেস করোনি।'

'জিম?' গালে গাল ঘষতে ঘষতে বলল বেলিন্দা।

'কি?'

'তোমাকে এক মুহূর্তের জন্যে ছাড়তে ইচ্ছে করে না। এক কাজ করো না। চিঠি লিখে র্যাঙ্কের কাউকে পাঠিয়ে দাও। গরুগুলো গিয়ে নিয়ে আসুক।'

চিঠি লিখে র্যাঙ্কের কাউকে পাঠিয়ে দাও। গরুগুলো গিয়ে নিয়ে আসুক।'

মৃত্যুর স্বাদ

‘মন্দ বলোনি। ঠিক আছে, কাল সকালেই পাঠাব।’

ম্দু ডাক ভেসে এল আন্তাবল থেকে। জবাবে মোলায়েম আরেকটা ডাক।
জিমের কালো ঘোড়াটার সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে বেলিন্দার সুন্দরী ঘোটকীর। এই
নিশ্চি রাতে প্রেমালাপ চলছে ঘোড়া দুটোর।

কান পেতে শুনল মানব-মানবী।

ম্দু হাসি ফুটল জিমের ঠোঁটে।

হাত ধরে টানল বেলিন্দা। ‘ওঠো, ঘরে যাই! ভীষণ ঠাণ্ডা এখানে।’

সবিনয়ে নিবেদন

হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজ এই লাইব্রেরিটি ৫ম মাসে পদার্পন করল। বইয়ের সংখ্যাও ২০০ অতিক্রম করেছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এই সাইটের জন্মলগ্ন থেকেই শুভানুধ্যায়ীর অভাব ছিল না। তাদের প্রবল উৎসাহ আমাকে প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি কঠিন আর্থিক অনটনের মধ্যদিয়ে সময়টা অতিক্রম করছি, কিন্তু পাঠকের উৎসাহ দেখলে আমি সব কষ্ট ভুলে যাই।

আমার মূল উদ্দেশ্য যত বেশি সংখ্যক বাংলা বই অনলাইনে নিয়ে আসা। মূর্ছনা এই দিক থেকে অগ্রগামী, তাদের বইয়ের আমি বড় ভক্ত। তবে বিভিন্ন কারণে তারা অনেকদিন নিয়মিত বই দিচ্ছেন না, তাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আমার সাইটের অনেক পাঠক মূর্ছনার খোঁজ রাখেন না, তাদের জন্যই মূর্ছনার কথা বললাম। আমি মূলত মূর্ছনার সাথে মিল রেখে বই আপলোডের চেষ্টা করি, তাদের যে বইগুলো আছে, সেইগুলো আমি দিতে চাই না।

পরিশেষে একটা কথা না বললেই নয়। অনেকেই আমার সাইটের এ্যাডগুলো ব্রাউজ করেন, কিন্তু সঠিকভাবে না করার ফলে আমার খুব বেশি লাভ হয় না। আমি একটু গাইডেন্স দিই, কিভাবে ব্রাউজ করলে আমি উপকৃত হব।

যে লিংকটা ওপেন করবেন, সেটা ওপেন হলেই ক্লিক করবেন না। বরং সেই সাইটের বিভিন্ন লিংকে যান, এবং এভাবে ২০-২৫ মিনিট অতিবাহিত করুন। পারলে আরও বেশি সময় সাইটটি খুলে রাখুন। তবে মাসে একবারের বেশি ব্রাউজ করার দরকার নেই। বাংলাদেশ থেকে যারা ব্রাউজ করেন, তারা ২ মাসে একবার ব্রাউজ করবেন। আর উপমহাদেশের বাইরে যারা আছেন, তারা মাসে ২ বারও করতে পারেন, সমস্যা নেই।

আপনাদের সাজেশন, অনুরোধ আমার একান্ত কাম্য। কোনও সংকোচ না করে আমাকে ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বলতে পারেন, বইয়ের অনুরোধ জানাতে পারেন, আমি খুশি হব।

শেষে একটি কথা, আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার। আমার একটি মোবাইল জাভা সফটওয়্যার ২ লক্ষ্যের বেশীবার ডাউনলোড হয়েছে, এখনও হয়ে চলেছে। আপনারা যারা জানেন না, তারা মোবাইল ইংলিশ টু বাংলা ডিকশনারি টা ট্রাই করতে পারেন। www.getjar.com এ গিয়ে সার্চ বক্সে Bangla লিখে সার্চ দিলে দেখবেন Bdictionary চলে এসেছে। আপনাদের মতামতের অপেক্ষায় রইলাম। বইয়ের আলোকে আলোকিত হোক আমাদের জীবন।

E-mail: ayan.00.84@gmail.com

Mobile: +8801734555541

+8801920393900